

শেষের কবিতা

স্বপ্নসংগীত



চি রা য় ত বা ং লা গ্র হ় মা লা

শেষের কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৭৭

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৯৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

চতুর্থ সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ
চৈত্র ১৪১৯ মার্চ ২০১৩



প্রকাশক

মো. আলাউদ্দিন সরকার

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ

ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ

গ্রাফসম্যান রিপ্ৰোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং

৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ

প্রব এম

মূল্য

সত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0076-4

অমিত-চরিত

অমিত রায় ব্যারিস্টার। ইংরেজি ছাঁদে রায় পদবী 'রয়' ও 'রে' রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে, কিন্তু সংখ্যা হল বৃদ্ধি। এই কারণে নামের অসামান্যতা কামনা করে অমিত এমন একটি বানান বানাতে যাতে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুদীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল— অমিট রায়ে।

অমিতর বাপ ছিলেন দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার। যে পরিমাণ টাকা তিনি জন্মিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতেও অমিত বিনা বিপত্তিতে এ যাত্রা টিকে গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ.-র কোঠায় পা দেবার পূর্বেই অমিত অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়; সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবৎ না দিতে দিতে ওর সাত বছর গেল কেটে। বুদ্ধি বেশি থাকতে পড়াশুনো বেশি করে নি, অথচ বিদ্যেতে কমতি আছে বলে ঠাহর হয় না। ওর বাপ ওর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর ইচ্ছে ছিল, তাঁর একমাত্র ছেলের মনে অক্সফোর্ডের রঙ এমন পাকা করে ধরে যাতে দেশে এসেও খোপ সয়।

অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে। আমি নবীন লেখক, সংখ্যায় আমার পাঠক স্বল্প, যোগ্যতায় তাদের সকলের সেরা অমিত। আমার লেখার ঠট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেছে। ওর বিশ্বাস, আমাদের দেশের সাহিত্যবাজারে যাদের নাম আছে তাদের স্টাইল নেই। জীবিস্থিতিতে উট জন্তুটা যেমন, এই লেখকদের রচনাও তেমনি, ঘাড়ে-গর্দানে সামনে-পিছনে পিঠে-পেটে বেখাপ; চালটা ঢিলে, নড়বড়ে; বাংলা সাহিত্যের মতো ন্যাড়া ফ্যাকাশে মরুভূমিতেই তার চলন। সমালোচকদের কাছে সময় থাকতে বলে রাখা ভালো, মতটা আমার নয়।

অমিত বলে ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে, যারা সাহিত্যের ওমরাও-দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা-দলের, দশের মন রাখা যাদের ব্যাবসা, ফ্যাশান তাদেরই। বঙ্কিমি স্টাইল বঙ্কিমের লেখা বিষবক্ষে, বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন : বঙ্কিমি ফ্যাশান নসিরামের লেখা মনোমোহনের মোহনবাগানে, নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে। বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নীচে ব্যাবসাদার নাচওয়ালীর দর্শন মেলে, কিন্তু শুভদৃষ্টিকালে বধুর মুখ দেখবার বেলায় বেনারসি ওড়নার ঘোমটা চাই। কানাত হল ফ্যাশানের, বেনারসি হল স্টাইলের— বিশেষের মুখ বিশেষ রঙের ছায়ায় দেখবার জন্যে। অমিত বলে, হাটের লোকের পায়ে-চলা রাস্তার বাইরে আমাদের পা সরতে ভরসা পায় না বলেই আমাদের দেশে স্টাইলের এত অনাদর। দক্ষযজ্ঞের গল্পে এই কথাটির পৌরাণিক ব্যাখ্যা মেলে। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ একেবারে স্বর্গের ফ্যাশানদুরন্ত দেবতা, যাজ্ঞিক মহলে তাঁদের নিমন্ত্রণও জুটত। শিবের ছিল স্টাইল, এত ওরিজিন্যাল যে মন্ত্র-পড়া যজ্ঞমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বে-দস্তুর বলে জানত। অক্সফোর্ডের বি.এ.-র মুখে এ-সব কথা শুনে আমার ভালো লাগে। কেননা আমার বিশ্বাস, আমার লেখার স্টাইল আছে— সেইজন্যেই আমার সকল বইয়েরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি, তারা 'ন পুনরাবর্তন্তে'।

আমার শ্যালক নবকৃষ্ণ অমিতর এ-সব কথা একেবারে সইতে পারত না; বলত, 'রেখে দাও তোমার অক্সফোর্ডের পাস।' সে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে রোমহর্ষক এম. এ.; তাকে পড়তে হয়েছে বিস্তর, বুঝতে হয়েছে অল্প। সেদিন সে আমাকে বললে, 'অমিত কেবলই ছোটো লেখককে বড়ো করে বড়ো লেখককে খাটো করবার জন্যেই। অবজ্ঞার ঢাক পিটোবার কাজে তার শখ, তোমাকে সে করেছে তার ঢাকের কাঠি।' দুঃখের বিষয় এই আলোচনা-স্থলে উপস্থিত ছিলেন আমার স্ত্রী, স্বয়ং ওর সহোদর। কিন্তু পরম সন্তোষের বিষয় এই যে, আমার শ্যালকের কথা তাঁর একটুও ভালো লাগে নি। দেখলুম, অমিতর সঙ্গেই তাঁর রুচির মিল, অথচ পড়াশুনো বেশি করেন নি। স্ত্রীলোকের আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি !

অনেক সময় আমার মনেও খটকা লাগে যখন দেখি কত কত নামজাদা ইংরেজ লেখকদেরও নগণ্য করতে অমিতর বুক দমে না। তারা হল যাদের বলা যেতে পারে 'বহুবাজারে চলতি লেখক, বড়োবাজারের ছাপ-মারা'— প্রশংসা করবার জন্যে যাদের লেখা পড়ে দেখবার দরকারই হয় না, চোখ বুজে গুণগান করলেই

পাসমার্ক পাওয়া যায়। অমিতর পক্ষেও এদের লেখা পড়ে দেখা অনাবশ্যক, চোখ বুজে নিন্দে করতে ওর বাধে না। আসলে যারা নামজাদা তারা ওর কাছে বড়ো বেশি সরকারি, বর্ধমানের গুয়েটিং-কমের মতো; আর যাদেরকে ও নিজে আবিষ্কার করেছে তাদের উপর ওর খাস-দখল, যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলুন কামরা।

অমিতর নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য-বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে— পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম; অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা-মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তি-ভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না; মনটা এমন এক রকমের চকমকি যে ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের, যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এরকম ধুতি চলতি নয়। পাঞ্জাবি পরে, তার বা কাঁধ থেকে বোতাম ডান দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু'ভাগ করা; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনি ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাক-ঘড়ি, পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায়, একটা পাট-করা পাড়-ওয়াল মাদ্রাজি চাদর বা কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে, বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্মী টুপি, সাদার উপর সাদা-কাজ-করা। একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর এক রকমের উচ্চ হাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝি নে; যারা বোঝে তারা বলে কিছু আলুখালু গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে ডিসটিঙ্গুইশড। নিজেকে অপরূপ করার শখ ওর নেই, কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করবার কৌতুক ওর অপরিাপ্ত। কোনোমতে বয়স মিলিয়ে যারা কৃষ্টির প্রমাণে যুবক তাদের দর্শন মেলে পথে ঘাটে, অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নিজলা যৌবনের জোরেই একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে— সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।

এ দিকে ওর দুই বোন, যাদের ডাক-নাম সিসি এবং লিসি, যেন নতুন বাজারে অত্যন্ত হালের আমদানি, ফ্যাশানের-পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক-করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট-বিশেষ। উচু-খুর-ওয়াল জুতো, লেসওয়াল বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, শাড়িটা গায়ে তির্যগভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপটানো। এরা খুঁট খুঁট করে দ্রুত লয়ে চলে; উচ্চঙ্করে বলে; স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি; মুখ ঈষৎ বঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাঁউনি। গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর করে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষ বন্ধুর চোকির হাতার উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে।

আপন দলের মেয়েদের সঙ্গে অমিতর ব্যবহার দেখে তার দলের পুরুষদের মনে ঈর্ষার উদয় হয়। নির্বিশেষভাবে মেয়েদের প্রতি অমিতর উদাসীন্য নেই, বিশেষভাবে কারো প্রতি আসক্তিও দেখা যায় না, অথচ সাধারণভাবে কোনোখানে মধুর রসেরও অভাব ঘটে না। এক কথায় বলতে গেলে, মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে। অমিত পাটিতেও যায়, তাসও খেলে, ইচ্ছে করেই বাজিতে হারে, যে রমণীর গলা বেসুরো তাকে দ্বিতীয়বার গাইতে গীড়াপীড়ি করে, কাউকে বদ রঙের কাপড় পরতে দেখলে জিজ্ঞাসা করে কাপড়টা কোন্ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। যে-কোনো আলাপিতার সঙ্গেই কথা বলবে বিশেষ পক্ষপাতের সুর লাগায়; অথচ সবাই জানে ওর পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে মানুষ অনেক দেবতার পূজারি, আড়ালে সব দেবতাকেই সে সব দেবতার চেয়ে বড়ো বলবে স্বব করে; দেবতাদের বুঝতে বাঁকি থাকে না, অথচ খুশি হন। কন্যার মাতাদের আশা কিছুতেই কমে না, কিন্তু কন্যারা বুঝে নিয়েছে অমিত সোনার রঙের দিগন্তরেখা— ধরা দিয়েই আছে, তবু কিছুতেই ধরা দেবে না। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মন তর্কই করে, মীমাংসায় আসে না। সেইজন্যেই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এত দুঃসাহস। তাই অতি সহজেই সকলের সঙ্গে ও ভাব করতে পারে— নিকটে দাহবস্ত থাকলেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।

সেদিন পিকনিকে গঙ্গার ধারে যখন ওপারের ঘন কালো পুঞ্জীভূত স্তম্ভতার উপরে চাঁদ উঠল, ওর পাশে ছিল লিলা গঙ্গুলি। তাকে ও মৃদুস্বরে বললে, 'গঙ্গার ওপারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এপারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্ত কালের মধ্যে কোনোদিনই আর হবে না।'

প্রথমটা লিলা গঙ্গুলির মন এক মুহূর্তে ছলছলিয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে জানত এ কথাটায় যতখানি সত্য সে কেবল ঐ বলার কায়দাটুকুর মধ্যেই। তার বেশি দাবি করতে গেলে বৃন্দবুদের উপরকার বর্ণচ্ছটাকে দাবি

করা হয়। তাই নিজেকে ক্ষণকালের ষোর-লাগা থেকে ঠেলা দিয়ে লিলি হেসে উঠল; বললে, ‘অমিট, তুমি যা বললে সেটা এত বেশি সত্য যে না বললেও চলত। এইমাত্র যে ব্যাঙটা টপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল এটাও তো অনন্ত কালের মধ্যে আর কোনোদিন ঘটবে না!’

অমিত হেসে উঠে বললে, ‘তফাত আছে লিলি, একেবারে অসীম তফাত। আজকের সন্ধ্যাবেলায় ঐ ব্যাঙের লাফানোটা একটা খাপছাড়া ছেঁড়া জিনিস। কিন্তু তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐক্যাত্মিক সৃষ্টি— বেটোফেনের চন্দ্রালোকগীতিকা। আমার মনে হয়, যেন বিশ্বকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাকরা আছে, সে যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আংটি সম্পূর্ণ করলে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে— আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।’

‘ভালোই হল, তোমার ভাবনা রইল না অমিট, বিশ্বকর্মার স্যাকরার বিল তোমাকে শুধতে হবে না।’

‘কিন্তু লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-কোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলোটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপকরূপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব, তার পরে কী হবে ভেবে দেখো।’

লিলি অমিতকে পাথার বাড়ি তাড়না করে বললে, ‘তার পরে সোনার মুহূর্তটি অন্যমনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগলা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কত মুহূর্ত খসে পড়ে গেছে; ভুলে গেছ বলে তার হিসেব নেই।’

এই বলে লিলি তাড়াতাড়ি উঠে তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলে। অনেক ঘটনার মধ্যে এই একটা ঘটনার নমুনা দেওয়া গেল।

অমিতর বোন সিসি-লিসিরা ওকে বলে, ‘অমি, তুমি বিয়ে কর না কেন?’

অমিত বলে, ‘বিয়ে ব্যাপারটায় সকলের চেয়ে জরুরি হচ্ছে পাত্রী, তার নীচেই পাত্র।’

সিসি বলে, ‘অবাক করলে, মেয়ে এত আছে।’

অমিত বলে, ‘মেয়ে বিয়ে করতে সেই পুরাকালে, লক্ষণ মিলিয়ে। আমি চাই পাত্রী, আপন পরিচয়েই যার পরিচয়, জগতে যে অদ্বিতীয়।’

সিসি বলে, ‘তোমার ঘরে এলেই তুমি হবে প্রথম, সে হবে দ্বিতীয়, তোমার পরিচয়েই হবে তার পরিচয়।’

অমিত বলে, ‘আমি মনে মনে যে মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গরঠিকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। সে আকাশ থেকে পড়ন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমণ্ডল ছুঁতে-না-ছুঁতেই জ্বলে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস্তবঘরের মাটি পর্যন্ত আসা ঘটেই ওঠে না।’

সিসি বলে, ‘অর্থাৎ, সে তোমার বোনদের মতো একটুও না।’

অমিত বলে, ‘অর্থাৎ, সে ঘরে এসে কেবল ঘরের লোকেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।’

লিসি বলে, ‘আচ্ছা ভাই সিসি, বিমি বোস তো অমির জন্যে পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে, ইশারা করলেই ছুটে এসে পড়ে— তাকে ওর পছন্দ নয় কেন? বলে, ওর কালচার নেই। কেন ভাই, সে তো এম. এ— তে বটানিতে ফার্স্ট। বিদ্যেকেই তো বলে কালচার।’

অমিত বলে, ‘কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিক করে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।’

লিসি রেগে উঠে বলে, ‘ইস, বিমি বোসের আদর নেই ওঁর কাছে! উনি নিজেই নাকি তার যোগ্য? অমি যদি বিমি বোসকে বিয়ে করতে পাগল হয়েও ওঠে আমি তাকে সাবধান করে দেব, যেন ওর দিকে ফিরেও না তাকায়।’

অমিত বললে, ‘পাগল না হলে বিমি বোসকে বিয়ে করতে চাইবই বা কেন? সে সময়ে আমার বিয়ের কথা না ভেবে উপযুক্ত চিকিৎসার কথা ভেবো।’

আত্মীয়স্বজন অমিতর বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছে। তারা ঠিক করেছে, বিয়ের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা ওর নেই, তাই ও কেবল অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে আর উল্টো কথা বলে মানুষকে চমক লাগিয়ে বেড়ায়। ওর মনটা আলোয়ার আলো, মাঠে বাটে ধাঁধা লাগাতেই আছে, ঘরের মধ্যে তাকে ধরে আনবার জো নেই।

ইতিমধ্যে অমিত যেখানে সেখানে হো হো করে বেড়াচ্ছে— ফিরপোর দোকানে যাকে তাকে চা খাওয়াচ্ছে; যখন তখন মোটরে চড়িয়ে বন্ধুদের অনাবশ্যক ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে; এখন ওখান থেকে যা তা

মণ্ডপের ছাঁদে নয়; এমন-কি, যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট-বিল্ডিংয়ের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।... এখন থেকে ফেলে দাও মন ভোলাবার ছলাকলা ছন্দাবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন যদি কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে— অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে, তাই করতে গিয়েই তার হবে মরণ। তার পরে কিছুদিন যেতেই কিষ্কিন্দ্যা জেগে উঠবে, কোন্ হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে মনটাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। তখন আবার হবে টেনিসনের সঙ্গে পুনর্মিলন, বায়রনের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ, ডিকেন্সকে বলব, মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্যালভের জন্যে তোমাকে গাল দিয়েছি।... মোগল বাদশাদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের যত মুগ্ধ মিশ্রি মিলে যদি যেখানে সেখানে ভারত জুড়ে কেবলই গম্বুজওয়াল পাথরের বৃন্দব্দ বানিয়ে চলত তা হলে ভদ্রলোক মাত্রই যেদিন বিশ বছর বয়স পেরোত সেইদিনই বানশস্থ নিতে দেরি করত না। তাজমহলকে ভালো লাগবার জন্যেই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।’

(এইখানে বলে রাখা দরকার, কথার তোড় সামলাতে না পেরে সভার রিপোর্টারের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, সে যা রিপোর্ট লিখেছিল সেটা অমিতর বক্তৃতার চেয়েও অবোধ্য হয়ে উঠেছিল। তারই থেকে যে-কটা টুকরো উদ্ধার করতে পারলুম তাই আমরা উপরে সাজিয়ে দিয়েছি।)

তাজমহলের পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গে রবি ঠাকুরের ভক্ত আরক্ত-মুখে বলে উঠল, ‘ভালো জিনিস যত বেশি হয় ততই ভালো।’

অমিত বললে, ‘ঠিক তার উল্টো। বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প হয় বলেই তা ভালো, নইলে সে নিজেই ভিড়ে ঠেলায় হয়ে যেত মাঝারি।... যে-সব কবি যাট-সত্তর পর্যন্ত বাঁচতে একটুও লজ্জা করে না তারা নিজেকে শাস্তি দেয় নিজেকে সস্তা করে দিয়ে। শেষকালটায় অনুকরণের দল চারি দিকে ব্যুহ বেঁধে তাদেরকে মুখ ভ্যাগাচতে থাকে। তাদের লেখার চরিত্র বিগড়ে যায়, পূর্বের লেখা থেকে চুরি শুরু করে হয়ে পড়ে পূর্বের লেখার রিসিভরস্ অফ স্ট্যালন প্রপাটি। সে স্থলে লোকহিতের খাতিরে পাঠকের কর্তব্য হচ্ছে, কিছুতেই এই-সব অতিপ্রবীণ কবিদের বাঁচতে না দেওয়া— শারীরিক বাঁচার কথা বলছি নে, কাব্যিক বাঁচা। এদের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক প্রবীণ অধ্যাপক, প্রবীণ পোলিটিশন, প্রবীণ সমালোচক।’

সেদিনকার বক্তা বলে উঠল, ‘জানতে পারি কি, কাকে আপনি প্রেসিডেন্ট করতে চান? তার নাম করুন।’

অমিত ফস্ করে বললে, ‘নিবারণ চক্রবর্তী।’

সভার নানা চৌকি থেকে বিস্মিত রব উঠল, ‘নিবারণ চক্রবর্তী! সে লোকটা কে?’

‘আজকের দিনে এই-যে প্রেমের অক্ষুর মাত্র, আগামী দিনে এর থেকে উত্তরের বনস্পতি জেগে উঠবে।’

‘ইতিমধ্যে আমরা একটা নমুনা চাই।’

‘তবে শুনুন।’

বলে পকেট থেকে একটা সফ্র লম্বা ক্যাম্বিসে-বাঁধা খাতা বের করে তার থেকে পড়ে গেল—

আনিলাম
অপরিচিতের নাম
ধরণীতে,
পরিচিত জনতার সরণীতে।
আমি আগম্বুক,
আমি জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।
খোলো দ্বার,
বার্তা আনিয়াছি বিধাতার।
মহাকালেশ্বর
পাঠায়েছে দুর্লভ্য অক্ষর,
বল্ দুঃসাহসী কে কে
মৃত্যু পণ রেখে
দিবি তার দুরূহ উত্তর।

শুনিবে না।

মুচতার সেনা

করে পথরোধ।

ব্যর্থ ক্রোধ

হংকারিয়া পড়ে বুকে—

তরঙ্গের নিষ্ফলতা

নিত্য যথা

মরে মাথা ঠুকে

শৈলতট-পরে

আত্মঘাতী দম্ভভরে।

পুষ্পমাল্য নাহি মোর, রিক্ত বক্ষতল,

নাহি বর্ম অঙ্গদ কুণ্ডল।

শূন্য এ ললাটপট্টে লিখা

গুঢ় জয়টিকা।

ছিন্নকস্থা দরিদ্রের বেশ।

করিব নিঃশেষ

তোমার ভাণ্ডার।

খোলো খোলো দ্বার।

অকস্মাৎ

বাড়ায়েছি হাত,

যা দিবার দাও অচিরাৎ!

বক্ষ তব কেঁপে ওঠে, কম্পিত অর্গল,

পৃথ্বী টলমল।

ভয়ে আর্ত উঠিছে চীৎকারি

দিগন্ত বিদারি—

‘ফিরে যা এখনি,

রে দুর্দান্ত দুর্বল ভিখারি,

তোর কণ্ঠধ্বনি

ঘুরি ঘুরি

নিশীথনিদ্রার বক্ষে হানে তীব্র ছুরি।’

অস্ত্র আনো।

বক্ষনিয়া আমার পঞ্জরে হানো।

মৃত্যুরে মারুক মৃত্যু, অক্ষয় এ প্রাণ

করি যাব দান।

শৃঙ্খল জড়াও তবে,

বাধো মোরে, খণ্ড খণ্ড হবে

মুহূর্তে চকিতে—

মুক্তি ভব আমারি মুক্তিতে।

শাস্ত্র আনো।

হানো মোরে, হানো।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে

উর্ধ্বস্বরে চাহিবে খণ্ডিতে

চি রা য় ত বা ং লা গ্র হ় মা লা

দিব্য বাণী।
জানি জানি,
তর্কবাণ
হয়ে যাবে খান-খান।
মুক্ত হবে জীর্ণ বাক্যে আচ্ছন্ন দু চোখ,
হেরিবে আলোক।

অগ্নি জ্বালো।
আজিকার যাহা ভালো
কল্য যদি হয় তাহা কালো,
যদি তাহা ভস্ম হয়
বিস্বময়,
ভস্ম হোক।
দূর করো শোক।
মোর অগ্নিপরীক্ষায়
ধন্য হোক বিশ্বলোক অপূর্ব দীক্ষায়।

আমার দুর্বোধ বাণী
বিরুদ্ধ বুদ্ধির পরে মুষ্টি হানি
করিবে তাহারে উচ্চকিত,
আতঙ্কিত।
উন্মাদ আমার ছন্দ
দিবে ধন্দ
শান্তিলুপ্ত মুমুকুরে,
ভিক্ষাজীর্ণ বুভুকুরে।
শিরে হস্ত হেনে
একে একে নিবে মেনে
ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ে
লোকালয়ে
অপরিচিতের জয়,
অপরিচিতের পরিচয়—
যে অপরিচিত
বৈশাখের রুদ্র ঝড়ে বসুন্ধরা করে আন্দোলিত,
হানি বজ্রমুষ্টি
মেঘের কার্পণ্য টুটি
সংগোপন বর্ষণসঞ্চয়
ছিন্ন করে, মুক্ত করে সর্বজগন্ময়॥

রবি ঠাকুরের দল সেদিন চুপ করে গেল। শাসিয়ে গেল, লিখে জবাব দেবে।

সভাটাকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে মোটরে করে অমিত যখন বাড়ি আসছিল সিসি তাকে বললে, ‘একখানা আস্ত নিবারণ চক্রবর্তী তুমি নিশ্চয় আগে থাকতে গড়ে তুলে পকেটে করে নিয়ে এসেছ, কেবলমাত্র ভালোমানুষদের বোকা বানাবার জন্যে।’

অমিত বললে, ‘অনাগতকে যে মানুষ এগিয়ে নিয়ে আসে তাকেই বলে অনাগতবিধাতা। আমি তাই। নিবারণ চক্রবর্তী আজ মর্তে এসে পড়ল, কেউ তাকে আর ঠেকাতে পারবে না।’

সিসি অমিতকে নিয়ে মনে মনে খুব একটা গর্ব বোধ করে।

সে বললে, 'আচ্ছা অমিত, তুমি কি সকালবেলা উঠেই সেদিনকার মতো তোমার যত শানিয়ে-বলা কথা বানিয়ে রেখে দাও?'

অমিত বললে, 'সম্ভবপরের জন্যে সব সময়ে প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা; বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত। এ কথাটাও আমার নোটবইয়ে লেখা আছে!'

'কিন্তু তোমার নিজের মত বলে কোনো পদার্থই নেই; যখন যেটা বেশ ভালো শোনায় সেইটাই তুমি বলে বস।'

'আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তা হলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি মুহূর্তের প্রতিবিশ্ব পড়ত না।'

সিসি বললে, 'অমি, প্রতিবিশ্ব নিয়েই তোমার জীবন কাটবে।'

২

সংঘাত

অমিত বেছে বেছে শিলঙ পাহাড়ে গেল। তার কারণ, সেখানে ওর দলের লোক কেউ যায় না। আরো একটা কারণ, ওখানে কন্যাদায়ের বন্যা তেমন প্রবল নয়। অমিতের হৃদয়টার পরে যে দেবতা সর্বদা শরসন্ধান করে ফেরেন তাঁর আনাগোনা ফ্যাশানেবলু পাড়ায়। দেশের পাহাড়-পর্বতে যত বিলাসী বসতি আছে তার মধ্যে শিলঙে এদের মহলে তাঁর ট্যাগেট-প্র্যাকটিসের জায়গা সব চেয়ে সংকীর্ণ। বোনেরা মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'যেতে হয় একলা যাও আমরা যাচ্ছি নে।'

ঐ হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা, ডান হাতে টেনিস ব্যাট, গায়ে নকল পারসিক শালের ক্রোক পরে বোনারা গেল চলে দার্জিলিঙে। বিমি বোস আগেভাগেই সেখানে গিয়েছে। যখন ভাইকে বাদ দিয়ে বোনদের সমাগম হল তখন সে চার দিকে চেয়ে আবিষ্কার করলে, দার্জিলিঙে জনতা আছে, মানুষ নেই।

অমিত সবাইকে বলে গিয়েছিল সে শিলঙে যাচ্ছে নির্জনতা ভোগের জন্যে; দুদিন না যেতেই বুঝলে জনতা না থাকলে নির্জনতার স্বাদ মরে যায়। ক্যামেরা হাতে দৃশ্য দেখে বেড়াবার শখ অমিতের নেই। সে বলে, 'আমি টুরিস্ট না; মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার, চোখ দিয়ে গিলে খাবার ধাত একেবারেই নয়।'

কিছুদিন ওর কাটল পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই পড়ে পড়ে। গল্পের বই ছুঁলে না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়তে লাগল সুনীতি চট্টোজ্জের 'বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব', লেখকের সঙ্গে মতাস্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে। এখানকার পাহাড় পর্বত অরণ্য ওর শব্দতত্ত্ব এবং আলস্যজড়তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, কিন্তু সেটা মনের মধ্যে পুরোপুরি ঘনিষে ওঠে না; যেন কোনো রাগিণীর একঘেষে আলাপের মতো— ধূয়ো নেই, তাল নেই, সম নেই। অর্থাৎ, ওর মধ্যে বিস্তর আছে, কিন্তু এক নেই— তাই এলানো জিনিস ছড়িয়ে পড়ে, জমা হয় না। অমিতের আপন নিখিলের মাঝখানে একের অভাবে ও যে কেবলই চঞ্চলভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে সে দৃশ্য ওর এখানেও যেমন শহরেও তেমনি। কিন্তু শহরে সেই চাঞ্চল্যটাকে সে নানাপ্রকারে ক্ষয় করে ফেলে, এখানে চাঞ্চল্যটাই স্থির হয়ে জমে জমে ওঠে— বরনা বাধা পেয়ে যেমন সরোবর হয়ে দাঁড়ায়। তাই ও যখন ভাবছে, পালাই, পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে সিলেট-শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি এমন সময়ে আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নব-বর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে; এইবার ঘন বর্ষণে গিরিনিঝরিণীগুলোকে ক্ষেপিয়ে কুলছাড়া করবে। স্থির করলে এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্যে চেরাপুঞ্জির ডাকবাংলায় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিন্ত-আকাশে ক্ষেপে ক্ষেপে চমক দেয়, নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।

সেদিন সে পরল হাইলান্ডারি মোটা কম্বলের মোজা, পুরু সুকতলা ওয়ালান মজবুত চামড়ার জুতো, খাফি নরফোক কোর্তা, হাঁটু পর্যন্ত হুশ অধোবাস, মাথায় সোলা-টুপি। অবনী ঠাকুরের আঁকা যক্ষের মতো দেখতে হল না, মনে হতে পারত রাস্তা তদারক করতে বেরিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু পকেটে ছিল গোটা পাঁচ-সাত পাতলা এডিশনের নানা ভাষার কাব্যের বই।

আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা, ডান দিকে জঙ্গলে-ঢাকা খদ। এ রাস্তার শেষ লক্ষ্য অমিতের বাসা। সেখানে যাত্রী-সম্ভাবনা নেই, তাই সে আওয়াজ না করে অসতর্কভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়টা ভাবছিল

আধুনিক কালে দূরবর্তী শ্রেয়সীর জন্যে মোটর-দুতটাই প্রশস্ত— তার মধ্যে ধুমজ্যোতিঃসলিলমরুতাৎ সন্নিপাতঃ বেষ ঠিক পরিমাণেই আছে, আর চালকের হাতে একখানি চিঠি দিলে কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। ও ঠিক করে নিলে, আগামী বৎসরে আশাচর প্রথম দিনেই মেঘদূতবর্গিত রাস্তা দিয়েই মোটরে করে যাত্রা করবে, হয়তো বা অদৃষ্ট-ওর পথ চেয়ে দেহলীদন্তপুষ্পা যে পথিকবধুকে এতকাল বসিয়ে রেখেছে সেই অবস্তিকা হোক বা মালবিকাই হোক, বা হিমালয়ের কোনো দেবদারুচরিত্রিণীই হোক, ওকে হয়তো কোনো একটা অভাবনীয় উপলক্ষে দেখা দিতেও পারে। এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসেই দেখলে, আর-একটা গাড়ি উপরে উঠে আসছে। পাশ কাটাবার জায়গা নেই। ব্রেক কষতে কষতে গিয়ে পড়ল তার উপরে— পরস্পর আঘাত লাগল, কিন্তু অপঘাত ঘটল না। অন্য গাড়িটা খানিকটা গড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে আটকে থেমে গেল।

একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। সদ্য-মৃত্যু-আশঙ্কার কালে পটখানা তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি— চারি দিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দর-পর্বতের-নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী সমস্ত আন্দোলনের উপরে— মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে। দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখলে। দ্রয়িত্রকমে এ মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়তো দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।

মেয়েটির পরনে সরু-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষাচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অব্যবহৃত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ব ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কস্মিন্ পর্যন্ত, দু হাতে দুটি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের-বন্ধন-হীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কটকি-কাজ করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।

অমিত গাড়িতে টুপিটা খুলে রেখে তার সামনে চুপ করে এসে দাঁড়াল। যেন একটা পাওনা শাস্তির অপেক্ষায়। তাই দেখে মেয়েটির বুকি দয়া হল, একটু কৌতুকও বোধ করলে। অমিত মৃদুস্বরে বললে, 'অপরাধ করেছি।'

মেয়েটি হেসে বললে, 'অপরাধ নয়, ভুল। সেই ভুলের শুরু আমার থেকেই।'

উৎসজলের যে উচ্ছলতা ফুলে ওঠে মেয়েটির কণ্ঠস্বর তারই মতো নিটোল। অল্প বয়সের বালকের গলার মতো মসৃণ এবং প্রশস্ত। সেদিন ঘরে ফিরে এসে অমিত অনেকক্ষণ ভেবেছিল এর গলার সুরে যে একটি স্বাদ আছে, স্পর্শ আছে, তাকে বর্ণনা করা যায় কী করে। নোটবইখানা খুলে লিখলে, 'এ যেন অশ্বুরি তামাকের হালকা ধোঁওয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে— নিকোটিনের ঝাঁঝ নেই, আছে গোলাপজলের স্নিগ্ধ গন্ধ।'

মেয়েটি নিজের ক্রটি ব্যাখ্যা করে বললে, 'একজন বন্ধু আসার খবর পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। এই রাস্তায় খানিকটা উঠতেই শোফার বলেছিল, এ রাস্তা হতে পারে না। তখন শেষ পর্যন্ত না গিয়ে ফেরবার উপায় ছিল না, তাই উপরে চলেছিলেম। এমন সময় উপরওয়ালার ধাক্কা খেতে হল।'

অমিত বললে, 'উপরওয়ালার উপরেও উপরওয়ালা আছে একটা অতি কুশী কুটিল গ্রহ, এ তারই কু-কীর্তি।'

অপর পক্ষের ড্রাইভার জানালে, 'লোকসান বেশি হয় নি, কিন্তু গাড়ি সেবে নিতে দেরি হবে।'

অমিত বললে, 'আমার অপরাধী গাড়িটাকে যদি ক্ষমা করেন তবে আপনি যেখানে অনুমতি করবেন সেইখানেই পৌঁছিয়ে দিতে পারি।'

'দরকার হবে না, পাহাড়ে হেঁটে চলা আমার অভোস।'

'দরকার আমারই, মাপ করলেন তার প্রমাণ।'

মেয়েটি ঈষৎ দ্বিধায় নীরব রইল। অমিত বললে, 'আমার তরফে আরো একটু কথা আছে। গাড়ি হাঁকাই— বিশেষ একটা মহৎ কর্ম নয়, এ গাড়ি চালিয়ে পস্টারিটি পর্যন্ত পৌঁছাবার পথ নেই। তবু আরন্তে এই একটিমাত্র পরিচয়ই পেয়েছেন। অথচ এমনি কপাল সেটুকুর মধ্যেও গলদ। উপসংহারে এটুকু দেখাতে দিন যে জগতে অন্তত আপনার শোফারের চেয়ে আমি অযোগ্য নই।'

অপরচিত্তের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে অজানা বিপদের আশঙ্কায় মেয়েরা সংকোচ সরাতে চায় না। কিন্তু বিপদের এক ধাক্কাই উপক্রমণিকার অনেকখানি বিস্তৃত বেড়া এক দমে গেল ভেঙে। কোন দৈব নির্জন পাহাড়ের পথে হঠাৎ মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দু জনের মনে দেখাদেখির গাঁঠ বেঁধে দিলে। সবুর করলে না।

আকস্মিকের বিদ্যুৎ-আলোতে এমন করে যা চোখে পড়ল, প্রায় মাঝে মাঝে এ-যে রাত্রে জেগে উঠে অন্ধকারের পটে দেখা যাবে। চৈতন্যের মাঝখানটাতে তার গভীর ছাপ পড়ে গেল, নীল আকাশের উপরে সৃষ্টির কোন্-এক প্রচণ্ড ধাক্কা যখন সূর্য-নক্ষত্রের আগুন-জ্বলা ছাপ।

মুখে কথা না বলে মেয়েটি গাড়িতে উঠে বসল। তার নির্দেশমত গাড়ি পৌঁছল যথাস্থানে। মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে বললে, 'কাল যদি আপনার সময় থাকে একবার এখানে আসবেন, আমাদের কর্তামার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।'

অমিতর ইচ্ছে হল বলে, 'আমার সময়ের অভাব নেই, এখনি আসতে পারি।' সৎকোচে বলতে পারলে না।

বাড়ি ফিরে এসে ওর নোটবই নিয়ে লিখতে লাগল, 'পথ আজ হঠাৎ এ কী পাগলামি করলে! দুজনকে দু জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে আজ থেকে হয়তো এক রাস্তায় চালান করে দিলে। অ্যাস্ট্রনমার ভুল বলেছে। অজানা আকাশ থেকে চাঁদ এসে পড়েছিল পৃথিবীর কক্ষপথে— লাগল তাদের মোটরে মোটরে ধাক্কা, সেই মরণের তাড়নার পর থেকে যুগে যুগে দুজনে একসঙ্গেই চলেছে। এর আলাে ওর মুখে পড়ে, ওর আলাে এর মুখে। চলার বাঁধন আর ছেঁড়ে না। মনের ভিতরটা বলছে, আমাদের শুরু হল যুগল-চলন, আমরা চলার সূত্রে গাঁথব ক্ষণে-ক্ষণে-কুড়িয়ে-পাওয়া উজ্জ্বল নিমেষগুলির মালা। বাঁধা মাইনের বাঁধা খোরাকিতে ভাগ্যের দ্বারে পড়ে থাকবার জো রইল না; আমাদের দেনাপাওনা সবই হবে হঠাৎ।'

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারি করতে করতে অমিত মনে মনে বলে উঠল, 'কোথায় আজ নিবারণ চক্রবর্তী! এইবার ভর করে আমার স্পরে— বাণী দাও, বাণী দাও।'

বেরোল লম্বা সরু খাতাটা, নিবারণ চক্রবর্তী বলে গেল—

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রহি
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিস্ত।

নাই আমাদের কনকঠাপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন সঙ্কেবেলায়
নামহারী ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ,
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেন্ড্রনগুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালনললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না ঝাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কৃজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
কুচিৎ-কিরণে দীপ্ত।

এইখানে একবার পিছন ফেরা চাই। পশ্চাতের কথাটা সেরে নিতে পারলে গল্পটার সামনে এগোবার বাধা হবে না।

পূর্ব ভূমিকা

বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে চণ্ডীমণ্ডপের হাওয়ার সঙ্গে স্কুল-কলেজের হাওয়ার তাপের বৈষম্য ঘটতে সমাজবিদ্রোহের যে ঝড় উঠেছিল সেই ঝড়ের চাঞ্চল্যে ধরা দিয়েছিলেন জ্ঞানদাশংকর। তিনি সেকালের লোক, কিন্তু তাঁর তারিখটা হঠাৎ পিছলিয়ে সরে এসেছিল অনেকখানি একালে। তিনি আগাম জন্মেছিলেন। বুদ্ধিতে বাক্যে ব্যবহারে তিনি ছিলেন তাঁর বয়সের লোকদের অসমসাময়িক। সমুদ্রের-টেউ-বিলাসী পাখির মতো লোকনিদার ঝাপট বুক পেতে নিতেই তাঁর আনন্দ ছিল।

এমন-সকল পিতামহের নাতিরা যখন এইরকম তারিখের বিপর্যয় সংশোধন করতে চেষ্টা করে তখন তারা এক দোড়ে পৌঁছয় পঞ্জিকার একেবারে উষ্টো দিকের টার্মিনসে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। জ্ঞানদাশংকরের নাতি বরদাশংকর বাপের মৃত্যুর পর যুগ-হিসাবে বাপ-পিতামহের প্রায় আদিম পূর্বপুরুষ হয়ে উঠলেন। মনসাকেও হাতজোড় করেন, শীতলাকেও ‘মা’ বলে ঠাণ্ডা করতে চান। মাদুলি ধুয়ে জল খাওয়া শুরু হল; সহস্র দুর্গানাম লিখতে লিখতে দিনের পূর্বাহ্ন যায় কেটে, তাঁর এলেকায় যে বৈশ্যদল নিজেদের দ্বিজত্ব প্রমাণ করতে মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠেছিল অন্তরে বাহিরে সকল দিক থেকেই তাদের বিচলিত করা হল; হিন্দুত্বরক্ষার উপায়গুলিকে বিজ্ঞানের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ভাটপাড়ার সাহায্যে অসংখ্য প্যাস্ফুলেট ছাপিয়ে আধুনিক বুদ্ধির কপালে বিনা মূল্যে ঋষি-বাক্য-বর্ষণ করতে কাপণ্য করলেন না। অতি অল্পকালের মধ্যেই ক্রিয়াকর্মে, জপে তপে, আসনে আচমনে, ধ্যানে স্নানে, ধূপে ধুনোয়, গোব্রাহ্মণ-সেবায় শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশ্চিহ্ন করে বানালেন। অবশেষে গোদান, স্বর্ণদান, ভূমিদান, কন্যাদায়-পিতৃদায়-মাতৃদায়-হরণ প্রভৃতির পরিবর্তে অসংখ্য ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্বাদ বহন করে তিনি লোকান্তরে যখন গেলেন তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়স।

এঁরই পিতার পরম বন্ধু, তাঁরই সঙ্গে এক-কলেজে-পড়া একই-হোটলে-চপ-ক্যাটলেট-খাওয়া রামলোচন বাঁড়ুজ্জের কন্যা যোগমায়ার সঙ্গে বরদার বিবাহ হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে যোগমায়ার পিতৃকুলের সঙ্গে পতিকুলে ব্যবহারগত বর্ণভেদ ছিল না। এঁর বাপের ঘরে মেয়েরা পড়াশুনো করেন, বাইরে বেরোন, এমন-কি, তাঁদের কেউ কেউ মাসিকপত্রে সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখেছেন। সেই বাড়ির মেয়ের শুচি সম্প্রকরণে যাতে অনুস্বার-বিসর্গের ভুলচুক না থাকে সেই চেষ্টায় লাগলেন তাঁর স্বামী। সনাতন সীমান্তরক্ষানীতির অটল শাসনে যোগমায়ার গতিবিধি বিবিধ পাসপোর্টপ্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল। চোখের উপরে তাঁর ঘোমটা নামল, মনের উপরেও। দেবী সরস্বতী যখন কোনো অবকাশে এঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন তখন পাহারায় তাঁকেও কাপড়-ঝাড়া দিয়ে আসতে হত। তাঁর হাতের ইংরেজি বইগুলো বাইরেই হত বাজেয়াপ্ত— প্রাক-বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী রচনা ধরা পড়লে চৌকাঠ পার হতে পেত না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎকৃষ্ট বীধাই বাংলা অনুবাদ যোগমায়ার শেল্ফে অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করে আছে। অবসরবিনোদন উপলক্ষে সেটা তিনি আলোচনা করবেন, এমন একটা আগ্রহ এ বাড়ির কর্তৃপক্ষের মনে অস্তিমকাল পর্যন্তই ছিল। এই পৌরাণিক লোহার সিন্দূকের মধ্যে নিজেকে সেফ ডিপজিটের মতো ভাঁজ করে রাখা যোগমায়ার পক্ষে সহজ ছিল না, তবু বিদ্রোহী মনকে শাসনে রেখেছিলেন। এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান্তরত্ন, এঁদের সভাপণ্ডিত। যোগমায়ার স্বাভাবিক স্বচ্ছ বুদ্ধি তাঁকে অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। তিনি স্পষ্টই বলতেন, ‘মা, এ-সমস্ত ক্রিয়াকর্মের জঞ্জাল তোমার জন্মে নয়। যারা মুচ তারা কেবল যে নিজেদেরকে নিজেরাই ঠকায় তা নয়, পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত-কিছই তাদের ঠকাতে থাকে। তুমি কি মনে কর, আমরা এ-সমস্ত বিশ্বাস করি? দেখ নি কি, বিধান দেবার বেলায় আমরা প্রয়োজন বুঝে শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাঁচে উলট-পালট করতে দুঃখ বোধ করি না— তার মানে, মনের মধ্যে আমরা বাঁধন মানি নে, বাইরে আমাদের মুচ সাজতে হয় মুচদের খাতিরে। তুমি নিজে যখন ভুলতে চাও না তখন তোমাকে ভোলাবার কাজ আমরা দ্বারা হবে না। যখন ইচ্ছা করবে, মা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ে, আমি যা সত্য বলে জানি তাই তোমাকে শাস্ত্র থেকে শুনিয়ে যাব।’

এক-একদিন তিনি এসে যোগমায়াকে কখনো গীতা কখনো ব্রহ্মভাষ্য থেকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে যেতেন। যোগমায়া তাঁকে এমন বুদ্ধিপূর্বক প্রশ্ন করতেন যে, বেদান্তরত্নমশায় পুলকিত হয়ে উঠতেন, এঁর কাছে আলোচনায় তাঁর উৎসাহের অন্ত থাকত না। বরদাশংকর তাঁর চারি দিকে ছোটো বড়ো যে-সব গুরু ও গুরুতরদের জুটিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি বেদান্তরত্নমশায়ের বিপুল অবজ্ঞা ছিল; তিনি যোগমায়াকে

বলতেন, ‘মা, সমস্ত শহরে একমাত্র এই তোমার ঘরে কথা কয়ে আমি সুখ পাই। তুমি আমাকে আত্মধিককার থেকে বাঁচিয়েছ।’

এমনি করে কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে পঞ্জিকার শিকলি-বাঁধা দিনগুলো কোনামতে কেটে গেল। জীবনটা আগাগোড়াই হয়ে উঠল আজকালকার খবরের-কাগজি কিছুত ভাষায় যাকে বলে ‘বাধ্যতামূলক’।

স্বামীর মৃত্যুর পরেই তার ছেলে যতিশংকর ও মেয়ে সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শীতের সময় থাকেন কলকাতায়, গরমের সময়ে কোনো-একটা পাহাড়ে। যতিশংকর এখন পড়ছে কলেজে; কিন্তু সুরমাকে পড়াবার মতো কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না হওয়াতে বহু সন্ধ্যানে তার শিক্ষার জন্যে লাভগ্যলতাকে পেয়েছেন। তারই সঙ্গে আজ সকালে আচমকা অমিতর দেখা।

8

লাবণ্য-পুরাবৃত্ত

লাবণ্যর বাপ অবনীশ দত্ত এক পশ্চিমি কালেজের অধ্যক্ষ। মাতৃহীন মেয়েকে এমন করে মানুষ করে ছন যে, বহু পরীক্ষা-পাসের ঘষাঘষিতেও তার বিদ্যাবুদ্ধিতে লোকসান ঘটাতে পারে নি। এমন-কি, এখনো তার পাঠানুরাগ রয়েছে প্রবল।

বাপের একমাত্র শখ ছিল বিদ্যায়। মেয়েটির মধ্যে তাঁর সেই শখটির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়েছিল। নিজের লাইব্রেরির চেয়েও তাকে ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, জ্ঞানের চর্চায় যার মনটা নিরেট হয়ে ওঠে, সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস নীচে থেকে ঠেলে ওঠবার মতো সমস্ত ফাটল মরে যায়, সে মানুষের পক্ষে বিয়ে করবার দরকার হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর মেয়ের মনে স্বামীসেবা-আবাদের যোগ্য যে নরম জমিটুকু বাকি থাকতে পারত সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেন্ট করে গাঁথা হয়েছে— খুব মজবুত পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে— বাইরে থেকে আঁচড় লাগলে দাগ পড়ে না। তিনি এত দূর পর্যন্ত ভেবে রেখেছিলেন যে, লাবণ্যর নাই-বা হল বিয়ে, পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই চিরদিন নয় গাঁঠ-বাঁধা হয়ে থাকল।

তাঁর আর-একটি স্মেহের পাত্র ছিল। তার নাম শোভনলাল। অল্প বয়সে পড়ার প্রতি এত মনোযোগ আর-কারো দেখা যায় না। প্রশস্ত কপালে, চোখের ভাবের স্বচ্ছতায়, ঠোঁটের ভাবের সৌজন্যে, হাসির ভাবের সরলতায়, মুখের ভাবের সৌক্যার্থে তার চেহারাটি দেখবামাত্র মনকে টানে। মানুষটি নেহাত মুখচোরা, তার প্রতি একটু মনোযোগ দিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

গরিবের ছেলে, ছাত্রবৃত্তির সোপানে সোপানে দুর্গম পরীক্ষার শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে শোভন যে নাম করতে পারবে, আর সেই খ্যাতি গড়ে তোলবার প্রধান কারিগরদের ফর্দে অবনীশের নামটা সকলের উপরে থাকবে, এই গর্ব অধ্যাপকের মনে ছিল। শোভন আসত তাঁর বাড়িতে পড়া নিতে, তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল তার অবাধ সঞ্চরণ। লাবণ্যকে দেখলে সে সংকোচে নত হয়ে যেত। এই সংকোচের অতিদূরত্ববশত শোভনলালের চেয়ে নিজের মাপটাকে বড়ো করে দেখতে লাবণ্যর বাধা ছিল না। দ্বিধা করে নিজেকে যে পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায় মেয়েরা তাকে যথেষ্ট স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করে না।

এমন সময় একদিন শোভনলালের বাপ ননীগোপাল অবনীশের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে খুব একচোট গাল পেড়ে গেল। নালিশ এই যে, অবনীশ নিজের ঘরে অধ্যাপনার ছুতোয় বিবাহের ছেল-ধরা ফাঁদ পেতেছেন, বৈদ্যর ছেলে শোভনলালের জাত মেরে সমাজ-সংস্কারের শখ মেটাতে চান। এই অভিযোগের প্রমাণস্বরূপে পেশিলে-আঁকা লাবণ্যলতার এক ছবি দাখিল করলে। ছবিটা আবিষ্কৃত হয়েছে শোভনলালের টিনের প্যাটারার ভিতর থেকে, গোলাপ-ফুলের পাপড়ি দিয়ে আচ্ছন্ন। ননীগোপালের সন্দেহ ছিল না, এই ছবিটা লাবণ্যেরই প্রণয়ের দান। পাত্র হিসাবে শোভনলালের বাজার-দর যে কত বেশি এবং আর কিছুদিন সবুর করে থাকলে সে দাম যে কত বেড়ে যাবে, ননীগোপালের হিসাবি বুদ্ধিতে সেটা কড়াই-গণায় মেলানো ছিল। এমন মূল্যবান জিনিসকে অবনীশ বিনা মূল্যে দখল করবার ফন্দি করছেন, এটাকে সিধ কেটে চুরি ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যেতে পারে! টাকা চুরির থেকে এর লেশমাত্র তফাত কোথায়!

এতদিন লাবণ্য জ্ঞানতেই পারে নি, কোনো প্রচ্ছন্ন বেদীতে শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর অগোচরে তার মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে। অবনীশের লাইব্রেরির এক কোণে নানাবিধ প্যাম্ফলেট ম্যাগাজিন প্রভৃতি আবর্জনার মধ্যে লাবণ্যর একটি অযত্নমান ফোটোগ্রাফ দৈবাৎ শোভনের হাতে পড়েছিল, সেইটে নিয়ে ওর কোনো আর্টিস্ট বন্ধুকে দিয়ে ছবি করিয়ে ফোটোগ্রাফটি আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে রেখেছে। গোলাপ-ফুলগুলিও ওর তরুণ মনের সলঙ্ক গোপন ভালোবাসারই মতো সহজে ফুটেছিল একটি বন্ধুর বাগানে, তার মধ্যে কোনো অনধিকার উদ্ধাত্যর ইতিহাস নেই। অথচ শাস্তি পেতে হল। লাজুক ছেলেরি মাথা হেঁট করে, মুখ লাল করে, গোপনে চোখের জল মুছে এই বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে গেল। দূর থেকে শোভনলাল তার আত্মনিবেদনের একটি শেষ পরিচয় দিলে, সেই বিবরণটা অন্তর্মুখী ছাড়া আর কেউ জানত না। বি.এ. পরীক্ষায় সে যখন পেয়েছিল প্রথম স্থান লাবণ্য পেয়েছিল তৃতীয়। সেটাতে লাবণ্যকে বড়ো বেশি আত্মলাঘবদুঃখ দিয়েছিল। তার দুটো কারণ ছিল, এক হচ্ছে শোভনের বৃদ্ধির পরে অবনীশের অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে লাবণ্যকে অনেক দিন আঘাত করেছে। এই শ্রদ্ধার সঙ্গে অবনীশের বিশেষ স্নেহ মিশে থাকতে পীড়াটা আরো হয়েছিল বেশি। শোভনকে পরীক্ষার ফলে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে সে চেষ্টা করেছিল খুব প্রাণপণেই। তবুও শোভন যখন তাকে ছাড়িয়ে গেল তখন এই স্পর্ধার জন্যে তাকে ক্ষমা করাই শক্ত হয়ে উঠল। তার মনে কেমন একটা সন্দেহ লেগে রইল যে, বাবা তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করলেই উভয় পরীক্ষিতের মধ্যে ফলবৈষম্য ঘটল, অথচ পরীক্ষার পড়া সম্বন্ধে শোভনলাল কোনোদিন অবনীশের কাছে এগোয় নি। কিছুদিন পর্যন্ত শোভনলালকে দেখলেই লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। এম. এ. পরীক্ষাতেও শোভনের প্রতিযোগিতায় লাবণ্যর জেতবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবু হল জিত। স্বয়ং অবনীশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শোভনলাল যদি কবি হত তা হলে হয়তো সে খাতা ভরে কবিতা লিখত— তার বদলে আপন পরীক্ষা-পাসের অনেকগুলো মোটা মার্কা লাবণ্যর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিলে।

তার পরে এদের ছাত্রদশা গেল কেটে। এমন সময় অবনীশ হঠাৎ প্রচণ্ড পীড়ায় নিজের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন যে, জ্ঞানের চর্চায় মনটা ঠাস-বোঝাই থাকলেও মনসিদ্ধ তার মধ্যেই কোথা থেকে বাধা ঠেলে উঠে পড়েন, একটুও স্থানাভাব হয় না। তখন অবনীশ সাতচল্লিশ। সে নিরতিশয় দুর্বল নিরুপায় বয়সে একটি বিধবা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলে, একেবারে তাঁর লাইব্রেরির গ্রন্থগৃহ ভেদ করে, তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রাকার ডিঙিয়ে। বিবাহে আর কোনো বাধা ছিল না, একমাত্র বাধা লাবণ্যর প্রতি অবনীশের স্নেহ। ইচ্ছার সঙ্গে বিষম লড়াই বাধল। পড়াশুনো করতে যান খুবই জোরের সঙ্গে, কিন্তু তার চেয়ে জোর আছে এমন-কোনো একটা চমৎকার চিন্তা পড়াশুনোর কাঁধে চেপে বসে। সমালোচনার জন্যে মর্ডান রিভিউ থেকে তাঁকে লোভনীয় বই পাঠানো হয় বৌদ্ধধর্মসাধারণের পুরাবৃত্ত নিয়ে; অনুদ্যাটিক বইয়ের সামনে স্থির হয়ে বসে থাকেন এক ভাঙা বৌদ্ধস্তূপেরই মতো, যার উপরে চেপে আছে বহুতর বৎসরের মৌন। সম্পাদক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু জ্ঞানীর স্তূপাকার জ্ঞান যখন একবার টলে তখন তার দশা এইরকমই হয়ে থাকে। হাতি যখন চোরাবালিতে পা দেয় তখন তার বাঁচবার উপায় কী।

এতদিন পরে অবনীশের মনে একটা পরিতাপ ব্যথা দিতে লাগল। তাঁর মনে হল, তিনি হয়তো পুঁথির পাতা থেকে চোখ তুলে দেখবার অবকাশ না পাওয়াতে দেখেন নি যে শোভনলালকে তাঁর মেয়ে ভালোবেসেছে; কারণ, শোভনের মতো ছেলেকে না ভালোবাসতে পারাটাই অস্বাভাবিক। সাধারণভাবে বাপ-জাতার পরেই রাগ ধরল— নিজের উপরে, ননীগোপালের পরে।

এমন সময় শোভনের কাছ থেকে এক চিঠি এল। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির জন্যে গুপ্তরাজবংশের ইতিহাস আশ্রয় করে পরীক্ষার প্রবন্ধ লিখবে বলে সে তাঁর লাইব্রেরি থেকে গুটিকতক বই ধার চায়। তখনি তিনি তাকে বিশেষ আদর করে চিঠি লিখলেন; বললেন, ‘পূর্বের মতোই আমার লাইব্রেরিতে বসেই তুমি কাজ করবে, কিছুমাত্র সংকোচ করবে না।’

শোভনলালের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ধরে নিলে এমন উৎসাহপূর্ণ চিঠির পিছনে হয়তো লাবণ্যর সম্মতি প্রচ্ছন্ন আছে। সে লাইব্রেরিতে আসতে আরম্ভ করলে। ঘরের মধ্যে যাওয়া-আসার পথে দৈবাৎ কখনো ক্ষণকালের জন্যে লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হয়। তখন শোভন গতিটাকে একটু মন্দ করে আনে। ওর একান্ত ইচ্ছে, লাবণ্য তাকে একটা-কোনো কথা বলে, জিজ্ঞাসা করে ‘কেমন আছ, যে প্রবন্ধ নিয়ে ও ব্যাপৃত সে সম্বন্ধে কিছু কৌতুহল প্রকাশ করে। যদি করত তবে খাতা খুলে এক সময় লাবণ্যর সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে ও বেঁচে যেত। ওর কতকগুলি নিজের উদ্ভাবিত বিশেষ মত সম্বন্ধে লাবণ্যর মত কী, জানবার জন্যে ওর অত্যন্ত উৎসুক। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো কথাই হল না, গায়ে পড়ে কিছু বলতে পারে এমন সাহসও ওর নেই।

এমন কয়েক দিন যায়। সেদিন রবিবার। শোভনলাল তার খাতাপত্র টেবিলের উপর সাজিয়ে একখানা বই নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে। তখন দুপুরবেলা, ঘরে কেউ নেই। ছুটির দিনের সুযোগ নিয়ে অবনীশ কোন-এক বাড়িতে যাচ্ছেন তার নাম করলেন না— বলে গেলেন, আজ আর চা খেতে আসবেন না। হঠাৎ এক সময় ভেজানো দরজা জ্বরে খুলে গেল। শোভনলালের বুকটা ধড়াস করে উঠল কেঁপে। লাভণ্য ঘরে ঢুকল। শোভন শব্দব্যস্ত হয়ে উঠে কী করবে ভেবে পেল না। লাভণ্য অগ্নিমূর্তি ধরে বললে, 'আপনি কেন এ বাড়িতে আসেন?'

শোভনলাল চমকে উঠল, মুখে কোনো উত্তর এল না।

'আপনি জানেন, এখানে আসা নিয়ে আপনার বাবা কী বলেছেন? আমার অপমান ঘটাতে আপনার সংকোচ নেই?'

শোভনলাল চোখ নিচু করে বললে, 'আমাকে মাপ করবেন, আমি এখন যাচ্ছি।'

এমন উত্তর পর্যন্ত দিলে না যে, লাভণ্যর পিতা তাকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে এনেছেন। সে তার খাতাপত্র সমস্ত সঞ্চার করে নিলে। হাত থর থর করে কাঁপছে; বোবা একটা ব্যথা বুকের পাঁজরগুলোকে ঠেলা দিয়ে উঠতে চায়, রাস্তা পায় না। মাথা হেঁট করে বাড়ি থেকে সে চলে গেল।

যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পারত তাকে ভালোবাসবার অবসর যদি কোনো একটা বাধায় ঠেকে ফসকে যায়, তখন সেটা না-ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় একটা অন্ধ বিদ্বেষে, ভালোবাসারই উল্টো পিঠে। একদিন শোভনলালকে বরদান করবে বলেই বুকি লাভণ্য নিজের অগোচরেই অপেক্ষা করে বসে ছিল। শোভনলাল তেমন করে ডাক দিলে না। তার পরে যা-কিছু হল সবই গেল তার বিরুদ্ধে। সকলের চেয়ে বেশি আঘাত দিলে এই শেষকালটায়। লাভণ্য মনের ক্ষোভে বাপের প্রতি নিতান্ত অন্যায বিচার করলে। তার মনে হল, নিজে নিষ্কৃতি পাবেন ইচ্ছে করেই শোভনলালকে তিনি আবার নিজে থেকে ডেকে এনেছেন, ওদের দুজনের মিলন ঘটাবার কামনায়। তাই এমন দারুণ ক্রোধ হল সেই নিরপরাধের উপরে।

তার পর থেকে লাভণ্য ক্রমাগতই জেদ করে করে অবনীশের বিবাহ ঘটাল। অবনীশ তাঁর সঙ্কিত টাকার প্রায় অর্ধাংশ তাঁর মেয়ের জন্যে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন। তাঁর বিবাহের পরে লাভণ্য বলে বসল, সে তার পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নেবে না, স্বাধীন উপার্জন করে চালাবে। অবনীশ মর্মান্বিত হয়ে বললেন, 'আমি তো বিয়ে করতে চাই নি লাভণ্য, তুমিই তো জেদ করে বিয়ে দিইয়েছ। তবে কেন আজ আমাকে তুমি এমন করে ত্যাগ করছ?'

লাভণ্য বললে, 'আমাদের সম্বন্ধ কোনোকালে যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইজন্যেই আমি এই সংকল্প করেছি। তুমি কিছু ভেবো না বাবা। যে পথে আমি যথার্থ সুখী হব সেই পথে তোমার আশীর্বাদ চিরদিন রেখো।'

কাজ তার জুটে গেল। সুবমাকে পড়বার সম্পূর্ণ ভার তার উপরে। যতিকেও অনায়াসে পড়াতে পারত, কিন্তু মেয়ে-শিক্ষায়ত্রীর কাছে পড়বার অপমান স্বীকার করতে যতি কিছুতেই রাজি হল না।

প্রতিদিনের বাঁধা কাজে জীবন একরকম চলে যাচ্ছিল। উদবৃত্ত সময়টা ঠাসা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে, প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে হালের বার্নার্ড শ'র আমল পর্যন্ত এবং বিশেষভাবে গ্রীক ও রোমান যুগের ইতিহাসে— গ্রেট, গিবন ও গিলবার্ট মারের রচনায়। কোনো কোনো অবকাশে একটা চঞ্চল হাওয়া এসে মনের ভিতরটা যে একটু এলোমেলো করে যেত না তা বলতে পারি নে, কিন্তু হাওয়ার চেয়ে স্থূল ব্যাঘাত হঠাৎ ঢুকে পড়তে পারে ওর জীবনযাত্রার মধ্যে এমন প্রশস্ত ফাঁক ছিল না। এমন সময় ব্যাঘাত এসে পড়ল মোটরগাড়িতে চড়ে, পথের মাঝখানে, কোনো আওয়াজমাত্র না করে। হঠাৎ গ্রীস রোমের বিরাট ইতিহাসটা হালকা হয়ে গেল, আর সমস্ত-কিছুকে সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড় বর্তমান ওকে নাড়া দিয়ে বললে 'জাগো'। লাভণ্য এক মুহূর্তে জেগে উঠে এতদিন পরে আপনাকে বাস্তবরূপে দেখতে পেলে— জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে।

৫

আলাপের আরম্ভ

অতীতের ভগ্নাবশেষ থেকে এবার ফিরে আসা যাক বর্তমানের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

লাভণ্য পড়বার ঘরে অমিতকে বসিয়ে রেখে যোগমায়াকে খবর দিতে গেল। সে ঘরে অমিত বসল যেন পদ্যের মাঝখানটাতে ভ্রমরের মতো। চারি দিকে চায়, সকল জিনিস থেকেই কিসের ছাঁওয়া লাগে, ওর মনটাকে দেয় উদাস করে। শেলফে, পড়বার টেবিলে, ইংরেজি সাহিত্যের বই দেখলে; সে বইগুলো যেন বেঁচে উঠেছে। সব

লাবণ্যর পড়া বই, তার আঙুলে-পাতা-ওলটানো, তার দিনরাত্রির-ভাবনা-লাগা, তার উৎসুক-দৃষ্টির-পথ-চলা, তার অন্যমনস্ক দিনে কোলের উপর পড়ে-থাকা বই। চমকে উঠল যখন টেবিলে দেখতে পেলে ইংরেজ কবি ডন-এর কাব্যসংগ্রহ। অকস্মাৎ থাকতে ডন এবং তাঁর সময়কার কবিদের গীতিকাব্য ছিল অমিতর প্রধান আলোচ্য, এইখানে এই কাব্যের উপর দৈবাজ্ঞ দুজনের মন এক জায়গায় এসে পরস্পরকে স্পর্শ করল।

এতদিনকার নিরুৎসুক দিনরাত্রির দাগ লেগে অমিতর জীবনটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, যেন মাস্টারের হাতে ইস্কুলের প্রতি-বছরে-পড়ানো একটা টিলে মলাটের টেকস্ট বুক। আগামী দিনটার জন্য কোনো কৌতূহল ছিল না, আর বর্তমান দিনটাকে পুরো মন দিয়ে অভ্যর্থনা করা ওর পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। এখন সে এইমাত্র এসে পৌঁছল একটা নতুন গ্রন্থে; এখানে বস্তুর ভার কম; পা মাটি ছাড়িয়ে যেন উপর দিয়ে চলে; প্রতি মুহূর্তে ব্যগ্র হয়ে অভাবনীয়ের দিকে এগোতে থাকে; গায়ে হাওয়া লাগে, আর সমস্ত শরীরটা যেন বাঁশি হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, আকাশের আলো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, আর ওর অন্তরে অন্তরে যে উত্তেজনার সঞ্চারণ হয় সেটা গাছের সর্বাঙ্গপ্রবাহিত রসের মধ্যে ফুল ফোটার উত্তেজনার মতো। মনের উপর থেকে কত দিনের ধূলা-পড়া পর্দা উঠে গেল, সামান্য জিনিসের থেকে ফুটে উঠছে অসামান্যতা। তাই যোগমায়া যখন ধীরে ধীরে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন সেই অতি সহজ ব্যাপারেও আজ অমিতকে বিস্ময় লাগল। সে মনে মনে বললে, ‘আহা, এ তো আগমন নয়, এ যে আবির্ভাব!’

চল্লিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স, কিন্তু বয়সে তাঁকে শিথিল করে নি, কেবল তাঁকে গভীর শুভ্রতা দিয়েছে। গৌরবর্ণ মুখ টস টস করছে। বৈধব্যরীতিতে চুল ছাঁটা; মাতৃভাবে পূর্ণ প্রসন্ন চোখ; হাসিটি স্নিগ্ধ। মোটা থান চাদরে মাথা বেঁটন করে সমস্ত দেহ সম্বৃত। পায়ে জুতো নেই, দুটি পা নির্মল সুন্দর। অমিত তাঁর পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম করলে ওর শিরে শিরে যেন দেবীর প্রসাদের ধারা বয়ে গেল।

প্রথম পরিচয়ের পরে যোগমায়া বললেন, ‘তোমার কাকা অমরেশ ছিলেন আমাদের জেলার সব চেয়ে বড়ো উকিল। একবার এক সর্বনেশে মকদ্দমায় আমরা ফতুর হতে বসেছিলুম, তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমাকে ডাকতেন বউদিদি বলে।’

অমিত বললে, ‘আমি তাঁর অযোগ্য ভাইপো। কাকা লোকসান বাঁচিয়েছেন, আমি লোকসান ঘটিয়েছি। আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা।’

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার মা আছেন?’

অমিত বললে, ‘ছিলেন। মাসি থাকাও খুব উচিত ছিল।’

‘মাসির জন্যে খেদ কেন বাবা?’

‘ভেবে দেখুন-না, আজ যদি ভাঙতুম মায়ের গাড়ি বকুনীর অন্ত থাকত না, বলতেন— এটা বাঁদরামি; গাড়িটা যদি মাসির হয় তিনি আমার অপটুতা দেখে হাসেন, মনে মনে বলেন— ছেলেমানুষি।’

যোগমায়া হেসে বললেন, ‘তা হলে নাহয় গাড়িখানা মাসিরই হল।’

অমিত লাফিয়ে উঠে যোগমায়ার পায়ের ধূলা নিয়ে বললে, ‘এইজন্যেই তো পূর্বজন্মের কর্মফল মানতে হয়। মায়ের কোলে জন্মেছি, মাসির জন্যে কোনো তপস্যাই করি নি— গাড়ি-ভাঙটাকে সংকর্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হলেন— এর পিছনে কত যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন!’

যোগমায়া হেসে বললেন, ‘কর্মফল কার বাবা? তোমার না আমার, না যারা মোটর-মেরামতের ব্যবসাস করে তাদের?’

ঘন চুলের ভিতর দিয়ে পিছন দিকে আঙুল চালিয়ে অমিত বললে, ‘শক্ত প্রশ্ন। কর্ম একার নয়, সমস্ত বিশ্বের, নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে তারই সম্মিলিত ধারা যুগে যুগে চলে এসে শুক্রবার ঠিক বেলা নটা বেজে আটচল্লিশ মিনিটের সময় লাগালে এক ধাক্কা। তার পরে?’

যোগমায়া লাবণ্যের দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু হাসলেন। অমিতর সঙ্গে আলাপ হতে না হতেই তিনি ঠিক করে বসে আছেন, এদের দুজনের বিয়ে হওয়া চাই। সেইটের প্রতি লক্ষ্য করেই বললেন, ‘বাবা, তোমরা দুজনে ততক্ষণ আলাপ করা, আমি এখানে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে আসি গে।’

দ্রুত তালে আলাপ জমাবার ক্ষমতা অমিতর। সে একেবারে শুরু করে দিলে, ‘মাসিমা আমাদের আলাপ করবার আদেশ করেছেন। আলাপের আদিতে হল নাম। প্রথমই সেটা পাকা করে নেওয়া উচিত। আপনি আমার নাম জানেন তো?— ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে বলে প্রপার নেম।’

লাবণ্য বললে, 'আমি তো জানি আপনার নাম অমিতবাবু।'

'ওটা সব ক্ষেত্রে চলে না।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'ক্ষেত্র অনেক থাকতে পারে, কিন্তু অধিকারীর নাম তো একই হওয়া চাই।'

'আপনি যে কথাটা বলছেন ওটা একালের নয়। দেশে কালে পাত্রে ভেদ আছে অথচ নামে নেই, ওটা অবৈজ্ঞানিক। Relativity of Names প্রচার করে আমি নামজাদা হব স্থির করেছি। তার গোড়াতেই জানাতে চাই, আপনার মুখে আমার নাম অমিতবাবু নয়।'

'আপনি সাহেবি কায়দা ভালোবাসেন? মিস্টার রয়?'

'একবারে সমুদ্রের ও পারের ওটা দূরের নাম। নামের দূরত্ব ঠিক করতে গেলে মেপে দেখতে হয় শব্দটা কানের সদর থেকে মনের অন্তরে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে।'

'দ্রুতগামী নামটা কী শুনি।'

'বেগ দ্রুত করতে গেলে বস্তু কমাতে হবে। অমিতবাবুর বাবুটা বাদ দিন।'

লাবণ্য বললে, 'সহজ নয়, সময় লাগবে।'

'সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। একঘড়ি বলে কোনো পদার্থ ত্রিভুবনে নেই, ট্যাকঘড়ি আছে, ট্যাক অনুসারে তার চাল। আইনস্টাইনের এই মত।'

লাবণ্য উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনার কিন্তু সন্মানের জল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।'

'ঠাণ্ডা জল শিরোধার্য করে নেব, যদি আলাপটাকে আরো একটু সময় দেন।'

'সময় আর নেই, কাজ আছে।' বলেই লাবণ্য চলে গেল।

অমিত তখনই সন্মান করতে গেল না। স্মিতহাস্যমিশ্রিত প্রত্যেক কথাটি লাবণ্যের ঠোঁটদুটির উপর কিরকম একটি চেহারা ধরে উঠছিল, বসে বসে সেইটি ও মনে করতে লাগল। অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমারাত্রির মতো, উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। তাকে মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন; তাকে দেখলেই বোঝা যায়, তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয়, সেইসঙ্গে আছে মননের শক্তি। এইটেতেই অমিতকে এত করে আকর্ষণ করেছে। অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে, ক্ষমা নেই; বিচার আছে, ধৈর্য নেই; ও অনেক জেনেছে, শিখেছে, কিন্তু শান্তি পায় নি—লাবণ্যর মুখে ও এমন একটি শান্তির রূপ দেখেছিল যে শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।

৬

নূতন পরিচয়

অমিত মিশুক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে তার বেশিক্ষণ চলে না। সর্বদাই নিজে বকাঝকা করা অভ্যাস; গাছপালা পাহাড়পর্বতের সঙ্গে হাসিতামাশা চলে না, তাদের সঙ্গে কোনোরকম উল্টো ব্যবহার করতে গেলেই ঘা খেয়ে মরতে হয়— তারাও চলে নিয়মে, অন্যের ব্যবহারেও তারা নিয়ম প্রত্যাশা করে— এককথায়, তারা অরসিক, সেইজন্যে শহরের বাইরে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ কী হল, শিলঙ পাহাড়টা চার দিক থেকে অমিতকে নিজের মধ্যে যেন রসিয়ে নিচ্ছে। আজ সে উঠেছে সূর্য ওঠবার আগেই; এটা ওর স্বধর্মবিরুদ্ধ। জানলা দিয়ে দেখলে, দেবদারু গাছের ঝালরগুলো কাঁপছে, আর তার পিছনে পাতলা মেঘের উপর পাহাড়ের ও পার থেকে সূর্য তার তুলির লম্বা লম্বা সোনালি টান লাগিয়েছে— আগুনে—জ্বলা যে—সব রঙের আভা ফুটে উঠেছে তার সম্বন্ধে চুপ করে থাকা ছাড়া আর—কোনো উপায় নেই।

তাড়াতাড়ি এক পেয়লা চা খেয়ে অমিত বেরিয়ে পড়ল। রাস্তা তখন নির্জন। একটা শেওলা—ধরা অতি প্রাচীন পাইন গাছের তলায় স্তরে স্তরে ঝরা পাতার সুগন্ধঘন আস্তরণের উপর পা ছড়িয়ে বসল। সিগারেট জ্বালিয়ে দুই আঙুলে অনেকক্ষণ চেপে রেখে দিলে, টান দিতে গেল ভুলে।

যোগমায়ার বাড়ির পথে এই বন। ভোজে বসবার পূর্বে রান্নাঘরটা থেকে যেমন আগাম গন্ধ পাওয়া যায়, এই জায়গা থেকে যোগমায়ার বাড়ির সৌরভটা অমিত সেইরকম ভোগ করে। সময়টা ঘড়ির ভদ্র দাগটাতে

এসে পৌঁছলেই সেখানে গিয়ে এক পেয়ালা চা দাবি করবে। প্রথমে সেখানে ওর যাবার সময় নির্দিষ্ট ছিল সঙ্কেবেলায়। অমিত সাহিত্যরসিক এই খ্যাতিটার সুযোগে আলাপ-আলোচনার জন্যে ও পেয়েছিল বাঁধা নিমন্ত্রণ। প্রথম দুই-চারি দিন যোগমায়া এই আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার কাছে ধরা পড়ল যে, তাতে করেই এ পক্ষের উৎসাহটাকে কিছু যেন কুণ্ঠিত করলে। বোঝা শক্ত নয় যে তার কারণ, দ্বিভাষ্যের জায়গায় বহুবচন-প্রয়োগ। তার পর থেকে যোগমায়ার অনুপস্থিত থাকবার উপলক্ষ ঘন ঘন ঘটত। একটু বিশ্রাম করতেই বোঝা গেল, সেগুলি অনিবার্য নয়, দৈবকৃত নয়, তাঁর ইচ্ছাকৃত। প্রমাণ হল, কর্তামা এই দুইটি আলোচনাপরায়ণের যে অনুরাগ লক্ষ করেছেন সেটা সাহিত্যানুরাগের চেয়ে বিশেষ একটু গাঢ়তর। অমিত বুঝে নিল যে, মাসির বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অঞ্চ মনটি আছে কোমল। এতে করেই আলোচনার উৎসাহ তার আরো প্রবল হল। নির্দিষ্ট কালটাকে প্রশস্ততর করবার অভিপ্রায়ে যতিশংকরের সঙ্গে আপসে ব্যবস্থা করলে, তাকে সকালে এক ঘণ্টা এবং বিকেলে দু'ঘণ্টা ইংরেজি সাহিত্য-পড়ায় সাহায্য করবে। শুরু করলে সাহায্য— এত বাহুল্যপরিমাণে যে, প্রায়ই সকাল গড়াত দুপুরে, সাহায্য গড়াত বাজে কথায়, অবশেষে যোগমায়ার এবং ভদ্রতার অনুরোধে মধ্যাহ্নভোজনটা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ত। এমনি করে দেখা গেল, অবশ্যকর্তব্যতার পরিধি প্রহরে প্রহরে বেড়েই চলে।

যতিশংকরের অধ্যাপনায় ওর যোগ দেবার কথা সকাল আটটায়। ওর প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা ছিল অসময়। ও বলত, যে জীবের গর্ভবাসের মেয়াদ দশ মাস তার ঘুমের মেয়াদ পশুপক্ষীদের মাপে সংগত হয় না। এতদিন অমিতর রাত্রিকোলাটা তার সকালবেলাকার অনেকগুলো ঘণ্টাকে পিল্পেগাড়ি করে নিয়েছিল। ও বলত, এই চোরাই সময়টা অবৈধ বলেই ঘুমের পক্ষে সব চেয়ে অনুকূল।

কিন্তু আজকাল ওর ঘুমটা আর অবিমিশ্র নয়। সকাল-সকাল জাগবার একটা আগ্রহ তার অন্তর্নিহিত। প্রয়োজনের আগেই ঘুম ভাঙে; তার পরে পাশ ফিরে শুতে সাহস হয় না, পাছে বেলা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিয়েছে; কিন্তু সময়-চুরির অপরাধ ধরা পড়বার ভয়ে সেটা বার বার করা সম্ভব হত না। আজ একবার ঘড়ির দিকে চাইলে, দেখলে বেলা এখনো সাতটার এ পারেই। মনে হল, ঘড়ি নিশ্চয় বন্ধ। কানের কাছে নিয়ে শুনলে টিক্ টিক্ শব্দ।

এমন সময় চমকে উঠে দেখে, ডান হাতে ছাতা দোলাতে দোলাতে উপরের রাস্তা দিয়ে আসছে লাভণ্য। সাদা শাড়ি, পিঠে কালো রঙের তিন-কোনা শাল, তাতে কালো ঝালর। অমিতর বুঝতে বাকি নেই যে, লাভণ্যর অর্ধেক দৃষ্টিতে সে গোচর হয়েছে, কিন্তু পূর্ণদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে লাভণ্য নারাজ। ঝাঁধের মুখ পর্যন্ত লাভণ্য যেই গেছে অমিত আর থাকতে পারলে না, দৌড়োতে দৌড়োতে তার পাশে উপস্থিত।

বললে, 'জানতেন এড়াতে পারবেন না, তবু দৌড় করিয়ে নিলেন। জানেন না কি দূরে চলে গেলে কতটা অসুবিধা হয়?'

'কিসের অসুবিধা?'

অমিত বললে, 'যে হতভাগা পিছনে পড়ে থাকে তার প্রাণটা উর্ধ্বস্বরে ডাকতে চায়। কিন্তু, ডাকি কী বলে? দেব-দেবীদের নিয়ে সুবিধে এই যে, নাম ধরে ডাকলেই তাঁরা খুশি। দুর্গা দুর্গা বলে গর্জন করতে থাকলেও ভগবতী দশভুজা অসম্ভট্ট হন না। আপনাদের নিয়ে যে মুশকিল।'

'না ডাকলেই চুকে যায়।'

'বিনা সম্বোধনেই চালাই যখন কাছে থাকেন। তাই তো বলি, দূরে যাবেন না। ডাকতে চাই অঞ্চ ডাকতে পারি নে, এর চেয়ে দুঃখ আর নেই।'

'কেন, বিলিতি কায়দা তো আপনার অভ্যাস আছে।'

'মিস ডাট? সেটা চায়ের টেবিলে। দেখুন—না, আজ এই আকাশের সঙ্গে পৃথিবী যখন সকালের আলোয় মিলল সেই মিলনের লগুটি সার্থক করবার জন্যে উভয়ে মিলে একটি রূপ সৃষ্টি করলে, তারই মধ্যে রয়ে গেল স্বর্গমর্তের ডাকনাম। মনে হচ্ছে না কি, একটা নাম ধরে ডাকা উপর থেকে নীচে আসছে, নীচে থেকে উপরে উঠে চলেছে? মানুষের জীবনেও কি ঐ রকমের নাম সৃষ্টি করবার সময় উপস্থিত হয় না? কম্পনা করুন—না, যেন এখনই প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েছি— নামের ডাক বনে বনে ধ্বনিত হল, আকাশের ঐ রঙিন মেঘের কাছ পর্যন্ত পৌঁছল, সামনের ঐ পাহাড়টা তাই শুনে মাথায় মেঘ মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল; মনে ভাবতেও কি পারেন সেই ডাকটা মিস ডাট?'

লাভণ্য কথাটাকে এড়িয়ে বললে, 'নামকরণে সময় লাগে, আপাতত বেড়িয়ে আসি গে।'

আমত তার দঙ্গ নিয়ে বললে, 'চলতে শিখতেই মানুষের দেরি হয়, আমার হল উল্টো; এতদিন পরে এখানে এসে তবে বসতে শিখেছি। ইংরেজিতে বলে, গড়ানে পাথরের কপালে শেওলা জোটে না; সেই ভেবেই অঙ্কার থাকতে কখন থেকে পাথর ধারে বসে আছি। তাই তো ভোরের আলো দেখলুম।'

লাবণ্য কথাটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ঐ সবুজ-ডানাওয়ালা পাখিটার নাম জানেন?'

অমিত বললে, 'স্বীবজ্জগতে পাখি আছে সেটা এতদিন সাধারণভাবেই জানতুম, বিশেষভাবে জানবার সময় পাই নি। এখানে এসে আশ্চর্য এই যে, স্পষ্ট জানতে পেরেছি পাখি আছে, এমন-কি তারা গানও গায়।'

লাবণ্য হেসে উঠে বললে, 'আশ্চর্য।'

অমিত বললে, 'হাসছেন! আমার গভীর কথাতেও গাভীর রাখতে পারি নে। ওটা মুদ্রাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ঐ গ্রহটি কৃষ্ণচতুর্দশীর সর্বনাশা রাত্রিও একটুখানি মুচকে না হেসে মরতেও জানে না।'

লাবণ্য বললে, 'আমাকে দোষ দেবেন না। বোধ হয় পাখিও যদি আপনার কথা শুনত হেসে উঠত।'

অমিত বললে, 'দেখুন, আমার কথা লোকে হঠাৎ বুঝতে পারে না বলেই হােসে, বুঝতে পারলে চুপ করে বসে ভাবত। আচ্ছ পাখিকে নতুন করে জানছি, এ কথায় লোকে হাসছে। কিন্তু এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আচ্ছ সমস্তই নতুন করে জানছি, নিজেকেও। এর উপরে তো হাসি চলে না। ঐ দেখুন-না, কথাটা একই, অথচ এইবার আপনি একেবারেই চুপ।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'আপনি তো বেশিদিনের মানুষ না, খুবই নতুন, আরো-নতুনের ঝোক আপনার মধ্যে আসে কোথা থেকে?'

'এর জবাবে খুব একটা গভীর কথাই বলতে হল যা চায়ের টেবিলে বলা চলে না। আমার মধ্যে নতুন যেটা এসেছে সেটাই অনাদি কালের পুরোনো— ভোরবেলাকার আলোর মতোই সে পুরোনো, নতুন—ফোটা ভূইচাঁপা ফুলেরই মতো, চিরকালের জিনিস, নতুন করে আবিষ্কার।'

কিছু না বলে লাবণ্য হাসলে।

অমিত বললে, 'আপনার এবারকার এই হাসিটি পাহারাওয়ালার চোর-ধরা গোল লঠনের হাসি। বুঝেছি, আপনি যে-কবির ভক্ত তার বই থেকে আমার মুখের এ কথাটা আগেই পড়ে নিয়েছেন। দোহাই আপনার, আমাকে দাগি চোর ঠাওরাবেন না— এক-এক সময়ে এমন অবস্থা আসে, মনের ভিতরটা শংকরাচার্য হয়ে ওঠে, বলতে থাকে, আমিই লিখেছি কি আর-কেউ লিখেছে এই ভেদজ্ঞানটা যায়। এই দেখুন-না, আচ্ছ সকালে বসে হঠাৎ বেয়াল গোল, আমার জানা সাহিত্যের ভিতর থেকে এমন একটা লাইন বের করি যেটা মনে হবে— এইমাত্র স্বয়ং আমি লিখলুম, আর কোনো কবির লেখবার সাধাই ছিল না!'

লাবণ্য থাকতে পারলে না, প্রশ্ন করলে, 'বের করতে পেরেছেন?'

'ঐ, পেরেছি।'

লাবণ্যর কৌতূহল আর বাধা মানল না, জিজ্ঞাসা করে ফেললে, 'লাইনটা কী বলুন-না।'

অমিত খুব আস্তে আস্তে কানে কানে বলার মতো করে বললে—

'For God's sake. hold your tongue
and let me love !'

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে অমিত জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি নিশ্চয় জানেন লাইনটা কার?'

লাবণ্য একটু মাথা ঝেঁকিয়ে ইশারায় জানিয়ে দিলে, 'ঐ।'

অমিত বললে, 'সেদিন আপনার টেবিলে ইংরেজ কবি ডন-এর বই আবিষ্কার করলুম, নইলে এ লাইন আমার মাথায় আসত না।'

'আবিষ্কার করলেন?'

'আবিষ্কার নয় তো কী? বইয়ের দোকানে বই চোখে পড়ে, আপনার টেবিলে বই প্রকাশ পায়। পাবলিক লাইব্রেরির টেবিল দেখেছি, সেটা তো বইগুলোকে বহন করে; আপনার টেবিল দেখলুম, সে যে বইগুলিকে বাসা দিয়েছে। সেদিন ডন-এর কবিতাকে প্রাণ দিয়ে দেখতে পেয়েছি। মনে হল, অন্য কবির দরজায় ঠেলাঠেলি ভিড়— বড়োলোকের শ্রাদ্ধ কাঙালিবিদায়ের মতো। ডন-এর কাব্যমহল নির্জন, ওখানে দুটি মানুষ পাশাপাশি বসবার জায়গাটুকু আছে। তাই অমন স্পষ্ট করে শুনতে পেলুম আমার সকালবেলাকার মনের কথাটি—

দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর।
ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।'

লাবণ্য বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি বাংলা কবিতা লেখেন নাকি?'

'ভয় হচ্ছে, আজ থেকে লিখতে শুরু করব বা। নতুন অমিত রায় কী যে কাণ্ড করে বসবে পুরোনো অমিত রায়ের তা কিছু জানা নেই। হয়তো—বা সে এখনি লড়াই করতে বেরোবে।'

'লড়াই! কার সঙ্গে?'

'সেইটে ঠিক করতে পারছি নে। কেবলই মনে হচ্ছে, খুব মস্ত কিছু একটার জন্যে একখুনি চোখ বুজে প্রাণ দিয়ে ফেলা উচিত, তার পরে অনুতাপ করতে হয় র'য়ে বাসে করা যাবে।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'প্রাণ যদি দিতেই হয় তো সাবধানে দেবেন।'

'সে কথা আমাকে বলা অনাবশ্যক। কমুন্যাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ। মুসলমান ঝাঁচিয়ে, ইংরেজ ঝাঁচিয়ে চলব। যদি দেখি বুড়োসুড়ো গোছের মানুষ, অহিংস মেজাজের ধার্মিক চেহারা, শিঙে বাজিয়ে মোটর হুকিয়ে চলেছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকিয়ে বলব, যুদ্ধে দেখি— ঐ যে লোক অজীর্ণ রোগ সারাবার জন্যে হাঁসপাতালে না গিয়ে এমন পাহাড়ে আসে, ঝিদে বাড়াবার জন্যে নির্লজ্জ হয়ে হাওয়া খেতে বেরোয়।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'লোকটা তবু যদি অমান্য করে চলে যায়?'

'তখন আমি পিছন থেকে দু হাত আকাশে তুলে বলব— 'এবারকার মতো ক্ষমা করলুম, তুমি আমার ভাতা, আমার এক ভারতমাতার সন্তান। বুঝতে পারছেন, মন যখন খুব বড়ো হয়ে ওঠে তখন মানুষ যুদ্ধও করে, ক্ষমাও করে।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'আপনি যখন যুদ্ধের প্রস্তাব করেছিলেন মনে ভয় হয়েছিল, কিন্তু ক্ষমার কথা যেরকম বোঝালেন তাতে আশ্বস্ত হলুম যে ভাবনা নেই।'

অমিত বললে, 'আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?'

'কী, বলুন।'

'আজ ঝিদে বাড়াবার জন্যে আর বেশি বেড়াবেন না।'

'আচ্ছা বেশ, তার পরে?'

'ঐ নীচে গাছতলায় যেখানে নানা রঙের ছ্যাংলা-পড়া পাথরটার নীচে দিয়ে একটুখানি জল ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছে ঐখানে বসবেন আসুন।'

লাবণ্য হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, 'কিন্তু সময় যে অল্প।'

'জীবনে সেইটেই তো শোচনীয় সমস্যা লাগণ্যদেবী, সময় অল্প। মরুপথের সঙ্গে আছে আধ-মশক মাত্র জল, যাতে সেটা উছলে উছলে শুকনো ধুলোয় মারা না যায় সেটা নিতান্তই করা চাই। সময় যাদের বিস্তর তাদেরই পাক্কুয়াল হওয়া শোভা পায়। দেবতার হাতে সময় অসীম; তাই ঠিক সময়টিতে সূর্য ওঠে, ঠিক সময়ে অস্ত যায়। আমাদের মেয়াদ অল্প, পাক্কুয়াল হতে গিয়ে সময় নষ্ট করা আমাদের পক্ষে অমিতব্যয়িতা। অমরাবতীর কেউ যদি প্রশ্ন করে 'ভবে এসে করলে কী' তখন কোন লজ্জায় বলব 'ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেবে কাজ করতে করতে জীবনের যা-কিছু সকল-সময়ের অতীত তার দিকে চোখ তোলবার সময় পাই নি?' তাই তো বলতে বাধ্য হলুম, চলুন ঐ জায়গাটাতে।'

ওর যেটাতে আপত্তি নেই সেটাতে আর-কারো যে আপত্তি থাকতে পারে, অমিত সেই আশঙ্কাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে কথাবার্তা কর। সেইজন্যে তার প্রস্তাবে আপত্তি করা শক্ত। লাবণ্য বললে, 'চলুন।'

ঘন বনের ছায়া। সরু পথ নেমেছে নীচে একটা বাসিয়া গ্রামের দিকে। অর্ধপথে আর-এক পাশ দিয়ে ক্ষীণ বর্নার ধারা এক জায়গায় লোকালয়ের পথটাকে অস্বীকার করে তার উপর দিয়ে নিজের অধিকারচিহ্নরূপ নুড়ি বিছিয়ে স্বতন্ত্র পথ চালিয়ে গেছে। সেইখানে পাথরের উপরে দুজন বসল। ঠিক সেই জায়গায় খানটা গভীর হয়ে খানিকটা জল জমে আছে, যেন সবুজ পর্দার ছায়ায় একটি পর্দানশীন মেয়ে, বাইরে পা বাড়াতে তার ভয়। এখানকার নির্জনতার আধরণটাই লাবণ্যকে নিরাবরণের মতো লজ্জা দিতে লাগল। সামান্য যা-তা একটা-কিছু বলে এইটাকে ঢাকা দিতে ইচ্ছে করছে, কিছুতেই কোনো কথা মনে আসছে না— স্বপ্নে যেরকম কণ্ঠস্বরে হয় সেই দশা।

অমিত বুঝতে পারলে, একটা-কিছু বলাই চাই। বললে, 'দেখুন আর্থা, আমাদের দেশে দুটো ভাষা, একটা সাধু, আর একটা চলতি। কিন্তু এ ছাড়া আরো একটা ভাষা থাকা উচিত ছিল, সমাজের ভাষা নয়, ব্যবসায়ের ভাষা নয়, আড়ালের ভাষা— এইরকম জায়গার জন্যে। পাখির গানের মতো, কবির কাব্যের মতো, সেই ভাষা

অন্যায়সেই কষ্ট দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল, যেমন করে কান্না বেরোয়। সেজন্যে মানুষকে বইয়ের দোকানে ছুটতে হয়, সেটা বড়ো লজ্জা। প্রত্যেকবার হাসির জ্বন্যে যদি ডেকিষ্টের দোকানে দৌড়াদৌড়ি করতে হত তা হলে কী হত ভেবে দেখুন। সত্যি বলুন লাভগ্যদেবী, এখনই আপনার সুর করে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ?'

লাভগ্য মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইল।

অমিত বললে, 'চায়ের টেবিলের ভাষায় কোনটা ভদ্র কোনটা অভদ্র তার হিসেব মিটেতে চায় না। কিন্তু এ জায়গায় ভদ্রও নেই অভদ্রও নেই। তা হলে কী উপায় বলুন। মনটাকে সহজ করবার জ্বন্যে একটা কবিতা না আওড়ালে তো চলছে না। গদ্যে অনেক সময় নেয়, অত সময় তো হাতে নেই। যদি অনুমতি করেন তো আরম্ভ করি।'

দিতে হল অনুমতি, নইলে লজ্জা করতে গেলেই লজ্জা।

অমিত ভূমিকায় বললে, 'রবি ঠাকুরের কবিতা বোধ হয় আপনার ভালো লাগে ?'

'হী, লাগে।'

'আমার লাগে না। অতএব আমাকে মাপ করবেন। আমার একজন বিশেষ কবি আছে, তার লেখা এত ভালো যে খুব অল্প লোকেই পড়ে। এমন-কি, তাকে কেউ গাল দেবার উপযুক্ত সম্মানও দেয় না। ইচ্ছে করছি, আমি তার থেকে আবৃত্তি করি।'

'আপনি এত ভয় করছেন কেন ?'

'এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শোকাহত। কবিরবকে নিন্দে করলে আপনারা জ্বাতে ঠেলেন, তাকে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে বাদ দিয়ে চললে তাতে করেও কঠোর ভাষার সৃষ্টি হয়। যা আমার ভালো লাগে তাই আর-একজনের ভালো লাগে না, এই নিয়েই পৃথিবীতে যত রক্তপাত।'

'আমার কাছ থেকে রক্তপাতের ভয় করবেন না। আপন রুচির জ্বন্যে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করি নে।'

'এটা বেশ বলেছেন, তা হলে নির্ভয়ে শুরু করা যাক—

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে ?

'বিষয়টা দেখছেন ? না-চেনার বন্ধন। সব চেয়ে কড়া বন্ধন। না-চেনা জ্বগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে বালাস পাব, একেই বলে মুক্তিভঙ্গ।—

কোন অন্ধরূপে
বিজ্ঞড়িত তন্দ্রা-জাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর,
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু-পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, কোথা সংগোপনে
আছ আত্মবিশ্মৃতির কোণে ?

'নিজেকেই ভুলে-থাকার মতো কোনো এমন, বাপসা কোণ আর নেই। সংসারে কত যে দেখবার ধন দেখা হল না, তারা আত্মবিশ্মৃতির কোণে মিলিয়ে আছে। তাই বলে তো হাল ছেড়ে দিলে চলে না।—

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে কানে মদুকঠে নয়।
করে নেব জ্বয়
সংশয়কুষ্টিত তোর বাণী;
দপ্ত বলে লব টানি
শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, স্বিধা-দ্বন্দ্ব হতে
নির্দয় আলাতে।

'একেবারে নাছোড়বান্দা। কত বড়ো জ্বোর। দেখেছেন রচনার পৌরুষ ?—

জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে,
ছিল হবে ভোর—

তোরে মুক্তি দিয়ে তবে মুক্তি হবে মোর।

'ঠিক এই তানটি আপনার নামজাদা লেখকের মধ্যে পাবেন না; সূর্যমণ্ডলে এ যেন আগুনের ঝড়। এ শুধু লিখিক নয়, এ নিষ্ঠুর জীবনতত্ত্ব।'

লাবণ্যর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—

'হে অচেনা,
দিন যায়, সঙ্ঘ্যা হয়, সময় রবে না—
তীব্র আকস্মিক
বাধা বন্ধ ছিন্ন করি দিক;
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।'

আবৃষ্টি শেষ হতে না হতেই অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরলে। লাবণ্য হাত ছাড়িয়ে নিলে না। অমিতর মুখের দিকে চাইলে, কিছু বললে না।

এর পরে কোনো কথা বলবার কোনো দরকার হল না। লাবণ্য ঘড়ির দিকে চাইতেও ভুলে গেল।

৭

ঘটকালি

অমিত যোগমায়ার কাছে এসে বললে, 'মাসিমা, ঘটকালি করতে এলেম। বিদায়ের বেলা কৃপণতা করবেন না।'

'পছন্দ হলে তবে তো? আগে নাম ধাম বিবরণটা বলো।'

অমিত বললে, 'নাম নিয়ে পাত্রটির দাম নয়।'

'তা হলে ঘটক-বিদায়ের হিসাব থেকে কিছু বাদ পড়বে দেখছি।'

'অন্যায় কথা বললেন। নাম যার বড়ো তার সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশি। ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মানরক্ষাতেই তার যত সময় যায়। মানুষটার অতি অল্প অংশই পড়ে স্ত্রীর ভাগে, পুরো বিবাহের পক্ষে সেটুকু যথেষ্ট নয়। নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্পবিবাহ, বহুবিবাহের মতোই গর্হিত।'

'আচ্ছা, নামটা নাহয় খাটো হল, রূপটা?'

'বলতে ইচ্ছে করি নে, পাছে অভ্যুক্তি করে বসি।'

'অভ্যুক্তির জোরেই বৃষ্টি বাজারে চালাতে হবে?'

'পাত্র-বাছাইয়ের বেলায় দুটি জিনিস লক্ষ্য করা চাই— নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে।'

'আচ্ছা, নাম রূপ থাক, বাকিটা?'

'বাকি যেটা রইল সব জড়িয়ে সেটাকে বলে পদার্থ। তা, লোকটা অপদার্থ নয়।'

'বুদ্ধি?'

'লোকে যাতে ওকে বুদ্ধিমান বলে হঠাৎ ভ্রম করে সেটুকু বুদ্ধি ওর আছে।'

'বিদ্যে?'

'স্বয়ং নিউটনের মতো। ও জানে যে, জ্ঞানসমুদ্রের কূলে সে নুড়ি কুড়িয়েছে মাত্র। তাঁর মতো সাহস করে বলতে পারে না, পাছে লোকে ফস করে বিশ্বাস করে বসে।'

'পাত্রের যোগ্যতার ফদটা তো দেখছি কিছু খাটো গোছের।'

'অন্নপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ করতে হবে বলেই শিব নিজেকে ভিখারি কবুল করেন, একটুও লক্ষ্য নেই।'

'তা হলে পরিচয়টা আরো একটু স্পষ্ট করো।'

'জানা ঘর। পাত্রটির নাম অমিতকুমার রায়। হাসছেন কেন মাসিমা? ভাবছেন কথটা ঠাট্টা?'

'সে ভয় মনে আছে বাবা, পাছে শেষ পর্যন্ত ঠাট্টাই হয়ে ওঠে।'

'এ সন্দেহটা পাত্রের পরে দোষারোপ।'

'বাবা, সংসারটাকে হেসে হালকা করে রাখা কম ক্ষমতা নয়।'

'মাসি, দেবতাদের সেই ক্ষমতা আছে, তাই দেবতার বিবাহের অযোগ্য; দময়ন্তী সে কথা বুঝেছিলেন।'

'আমার লাবণ্যকে সত্যি কি তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'কিরকম পরীক্ষা চান বলুন।'

'একমাত্র পরীক্ষা হচ্ছে, লাভণ্য যে তোমার হাতেই আছে, এইটি তোমার নিশ্চিত জানা।'

'কথাটাকে আর-একটু ব্যাখ্যা করুন।'

'যে রত্নকে সন্তায় পাওয়া গেল তারও আসল মূল্য যে বোঝে সেই জ্ঞানব জহরি।'

'মাসিমা, কথাটাকে বড়ো বেশি সূক্ষ্ম করে তুলছেন। মনে হচ্ছে, যেন একটা ছোটো গল্পের সাইকোলজিতে শান লাগিয়েছেন। কিন্তু কথাটা আসলে মোটা, জাগতিক নিয়মে এক ভদ্রলোক এক ভদ্ররমণীকে বিয়ে করবার জন্যে খেপেছে। দোষে গুণে ছেলেটি চলনসই, মেয়েটির কথা বলা বাহুল্য। এমন অবস্থায় সাধারণ মাসিমার দল স্বভাবের নিয়মেই খুশি হয়ে তখনি টেকিতে আনন্দনাড়ু কুটেতে শুরু করেন।'

'ভয় নেই বাবা, টেকিতে পা পড়েছে। ধরেই নাও লাভণ্যকে তুমি পেয়েইছ। তার পরেও, হাতে পেয়েও যদি তোমার পাবার ইচ্ছা প্রবল থেকেই যায় তবেই বুঝবে, লাভণ্যর মতো মেয়েকে বিয়ে করবার তুমি যোগ্য।'

'আমি যে এ-হেন আধুনিক, আমাকে সুদ্ধ তাক লাগিয়ে দিলেন।'

'আধুনিকের লক্ষণটা কী দেখলে?'

'দেখাছি, বিশ শতাব্দীর মাসিমারা বিয়ে দিতেও ভয় পান।'

'তার কারণ, আগেকার শতাব্দীর মাসিমারা যাদের বিয়ে দিতেন তারা ছিল খেলার পুতুল। এখন যারা বিয়ের উমেদার, মাসিমাদের খেলার শখ মেটাবার দিকে তাদের মন নেই।'

'ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাভণ্যকে বিয়ে করে এই তত্ত্ব প্রমাণ করবে বলেই অমিত রায় মর্তে অবতীর্ণ। নইলে, আমার মোটরগাড়িটা অচেতন পদার্থ হয়েও অস্থানে অসময়ে এমন অদ্ভুত অঘটন ঘটিয়ে বসবে কেন?'

'বাবা, বিবাহযোগ্য বয়সের সুর এখনো তোমার কথাবার্তায় লাগছে না, শেষে সমস্তটা বাল্যবিবাহ হয়ে না দাঁড়ায়।'

'মাসিমা, আমার মনের স্বকীয় একটা স্পেসিফিক গ্যাভিটি আছে, তারই গুণে আমার হৃদয়ের ভারী কথাগুলোও মুখে খুব হালকা হয়ে ভেসে ওঠে, তাই বলে তার ওজন কমে না।'

যোগমায়া গেলেন ভোজের ব্যবস্থা করতে। অমিত এ ঘরে ও ঘরে ঘুরে বেড়ালে, দর্শনীয় কাউকে দেখতে পেলেন না। দেখা হল যতিশংকরের সঙ্গে। মনে পড়ল, আজ তাকে 'অ্যান্টনি ক্রিয়োপ্যাটা' পড়বার কথা। অমিতর মুখের ভাব দেখেই যতি বুঝেছিল, জীবের প্রতি দয়া করেই আজ তার ছুটি নেওয়া আশু কর্তব্য। সে বললে, 'অমিতদা, কিছু যদি মনে না কর আজ আমি ছুটি চাই, আপনার শিলঙে বেড়াতে যাব।'

অমিত পুলকিত হয়ে বললে, 'পড়ার সময় যারা ছুটি নিতে জানে না তারা পড়ে, পড়া হজম করে না। তুমি ছুটি চাইলে আমি কিছু মনে করব এমন অসম্ভব ভয় করছ কেন?'

'কাল রবিবার ছুটি তো আছেই, পাছে তুমি তাই ভাব।'

'ইস্কুল-মাস্টারি বুদ্ধি আমার নয় ভাই, বরাদ্দ ছুটিকে ছুটি বলিই নে। যে ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা আর ঝাধা পশুকে শিকার করা একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়।'

হঠাৎ যে উৎসাহে অমিতকুমার ছুটিতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় মেতে উঠল তার মূল কারণটা অনুমান করে যতির খুব মজা লাগল। সে বললে, 'কয়দিন থেকে ছুটিতত্ত্ব সম্পর্কে তোমার মাথায় নতুন নতুন ভাব উঠছে। সেদিনও আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে। এমন আর কিছুদিন চললেই ছুটি নিতে আমার হাত পেকে যাবে।'

'সেদিন কী উপদেশ দিয়েছিলুম।'

'বলেছিলে, অকর্তব্যবুদ্ধি মানুষের একটা মহদগুণ, তার ডাক পড়লেই একটুও বিলম্ব করা উচিত হয় না। বলেই বই বন্ধ করে তখনই বাইরে দিলে ছুটি। বাইরে হয়তো একটা অকর্তব্যের কোথাও আবির্ভাব হয়েছিল, লক্ষ্য করি নি।'

যতির বয়স বিশের কোঠায়। অমিতর মনে যে চাকল্য উঠেছে ওর নিজের মনেও তার আন্দোলনটা এসে লাগছে। ও লাভণ্যকে এতদিন শিক্ষকজাতীয় বলেই ঠাউরেছিল, আজ অমিতর অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছে, সে নারীজাতীয়।

অমিত হেসে বললে, 'কাজ উপস্থিত হলেই প্রস্তুত হওয়া চাই, এই উপদেশের বাজার-দর বেশি, আকস্মিকি মোহরের মতো; কিন্তু ওর উল্টো পিঠে বোদাই থাকা উচিত— অকাজ উপস্থিত হলেই সেটাকে বাঁরের মতো মেনে নেওয়া চাই।'

'তোমার বীরত্বের পরিচয় আজকাল প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে।'

যতির পিঠ চাপড়িয়ে অমিত বললে, 'স্করুরি কাজটাকে এক কোপে বলি দেবার পবিত্র অষ্টমী তিথি তোমার জীবন-পঙ্খিকায় একদিন যখন আসবে দেবীপূজায় বিলম্ব কোরো না ভাই— তার পরে বিজয়াদশমী আসতে দেরি হয় না।'

যতি গেল চলে, অকর্তব্যবুদ্ধিও সজাগ, যাকে আশ্রয় করে অকাজ দেবা দেয় তারও দেখা নেই। অমিত ঘর ছেড়ে গেল বাইরে।

ফুলে আচ্ছন্ন গালাপের নতা; এক ধারে সূর্যমুখীর ভিড়, আর—এক ধারে চৌকো কাঠের টবে চন্দ্রমল্লিকা। ঢালু ঘাসের খেতের উত্তর-প্রান্তে এক মস্ত যুক্যালিপটস্ গাছ। তারই গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে লাভণ্য। ছাই রঙের আলোয়ান গায়ে, পায়ের উপর পড়েছে সকালবেলাকার রোদ্দুর। কোলে রুমালের উপর কিছু কুটির টুকরো, কিছু ভাঙা আখরোট। আজ সকালটা জীবসেবায় কাটাতে ঠাউরেছিল, তাও গেছে ভুলে। অমিত কাছে এসে দাঁড়াল, লাভণ্য মাথা তুলে তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল, যদু হাসিতে মুখ গেল ছেয়ে। অমিত সামনাসামনি বসে বললে, 'সুখবর আছে। মাসিমার মত পেয়েছি।'

লাভণ্য তার কোনো উত্তর না করে অদূরে একটা নিশ্ফলা পিচগাছের দিকে একটা ভাঙা আখরোট ফেলে দিলে। দেখতে দেখতে তার গুঁড়ি বেয়ে একটা কাঠবিড়ালি নেমে এল। এই জীবটি লাভণ্যর মুষ্টিভিখারি-দলের একজন।

অমিত বললে, 'যদি আপত্তি না কর, তোমার নামটা একটু ছেঁতে দেব !'

'তা দাও।'

'তোমাকে ডাকব বন্য বলে।'

'বন্য।'

'না না, এ নামটাতে হয়তো বা তোমার বদনাম হল। এরকম নাম আমাকেই সাজে। তোমাকে ডাকব— বন্যা। কী বল ?'

'তাই ডেকো, কিন্তু তোমার মাসিমার কাছে নয়।'

'কিছুতেই নয়। এ—সব নাম বীজমন্ত্রের মতো, কারো কাছে ফাঁস করতে নেই। এ রইল আমার মুখে আর তোমার কানে।'

'আচ্ছা বেশ।'

'আমারও ঐ-রকমের একটা বেসরকারি নাম চাই তো। ভাবছি, ব্রহ্মপুত্র কেমন হয় ! বন্যা হঠাৎ এল তারই কূল ভাসিয়ে দিয়ে।'

'নামটা সর্বদা ডাকবার পক্ষে ওজন ভারী।'

'ঠিক বলেছ। কুলি ডাকতে হবে ডাকবার জন্যে। তুমিই তা হলে নামটা দাও। সেটা হবে তোমারই সৃষ্টি।'

'আচ্ছা, আমি দেব তোমার নাম ছেঁটে। তোমাকে বলব— মিতা।'

'চমৎকার। পদাবলীতে ওরই একটি দোসর আছে— ঝধু। বন্যা, মনে ভাবছি, ঐ নামে নাহয় আমাকে সবার সামনেই ডাকলে, তাতে দোষ কী ?'

'ভয় হয়, এক কানের ধন পাঁচ কানে পাছে সস্তা হয়ে যায়।'

'সে কথা মিছে নয়। দুইয়ের কানে যেটা এক, পাঁচের কানে সেটা ভগ্নাংশ। বন্যা !'

'কী মিতা ?'

'তোমার নামে যদি কবিতা লিখি তো কোন্ মিলটা লাগাব জান ?— অনন্যা।'

'তাতে কী বোঝাবে ?'

'বোঝাবে তুমি যা তুমি তাই, তুমি আর—কিছুই নও।'

'সেটা বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়।'

'বল কী, খুবই আশ্চর্যের কথা। দৈবাৎ এক—একজন মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় যাকে দেখেই চমকে বলে উঠি, এ মানুষটি একেবারে নিজের মতো; পাঁচজনের মতো নয়। সেই কথাটি আমি কবিতায় বলব—

হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা,
আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।'

'তুমি কবিতা লিখবে নাকি ?'

'নিশ্চয়ই লিখব। কার সাধ্য রোমে তার গতি?'

'এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন?'

'কারণ বলি। কাল রাস্তির আড়াইটা পর্যন্ত, ঘুম না হলে যেমন এ-পাশ ও-পাশ করতে হয় তেমনি করেই কেবলই অকস্মাৎ বুক অফ ভর্সেস-এর এ-পাত ও-পাত উলটেছি। ভালোবাসার কবিতা খুঁজেই পেলুম না, আগে সেগুলো পায়ে পায়ে ঠেকত। স্পষ্টই বুঝতে পারছি, আমি লিখব বলেই সমস্ত পৃথিবী আজ অপেক্ষা করে আছে।'

এই বলেই লাভণ্যর ঝাঁ হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললে, 'হাত ছোড়া পড়ল, কলম ধরব কী দিয়ে? সব চেয়ে ভালো মিল হাতে হাতে মিল। এই-যে তোমার আঙুলগুলি আমার আঙুলে আঙুলে কণ্ঠা কইছে, কোনো কবিই এমন সহজ করে কিছু লিখতে পারলে না।'

'কিছুই তোমার সহজে পছন্দ হয় না, সেইজন্যে তোমাকে এত ভয় করি মিতা।'

'কিন্তু আমার কথাটা বুঝে দেখো। রামচন্দ্র সীতার সত্য যাচাই করতে চেয়েছিলেন বাইরের আগুনে, তাতেই সীতাকে হারালেন। কবিতার সত্য যাচাই হয় অগ্নিপরীক্ষায়, সে আগুন অন্তরের। যার মনে নেই সেই আগুন সে যাচাই করবে কী দিয়ে? তাকে পাঁচজননের মুখের কথা মেনে নিতে হয়, অনেক সময়েই সেটা দুর্মুখের কথা। আমার মনে আজ আগুন জ্বলেছে, সেই আগুনের ভিতর দিয়ে আমার পুরোনো সব পড়া আবার পড়ে নিচ্ছি, কত অল্পই টিকল। সব হু হু শব্দে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কবিদের হট্টগালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আজ আমাকে বলতে হয়, তোমরা অত চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না, ঠিক কথাটি আস্তে বলে—

For God's sake, hold your tongue
and let me love !'

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইল। তার পরে এক সময়ে লাভণ্যর হাতখানি তুলে ধরে অমিত নিজের মুখের উপর বুলিয়ে নিলে। বললে, 'ভেবে দেখো বন্যা, আজ এই সকালে ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীতে কত অসংখ্য লোকই চাচ্ছে, আর কত অল্প লোকই পেলে। আমি সেই অতি অল্প লোকের মধ্যে একজন। সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই সেই সৌভাগ্যবান লোককে দেখতে পেলে শিলঙ পাহাড়ের কোণে এই যুক্যালিপট্‌স্ গাছের তলায়। পৃথিবীতে পরামার্চ্য ব্যাপারগুলিই পরম নম্র, চোখে পড়তে চায় না। অথচ তোমাদের ঐ তারিণী তলাপাত কলকাতার গোলদিঘি থেকে আরম্ভ করে নোয়াখালি চাটগাঁ পর্যন্ত চাঁৎকার-শব্দে শূন্যের দিকে ঘূষি উঠিয়ে বাঁকা পলিটিল্লের ফাঁকা আওয়াজ ছড়িয়ে এল, সেই দুর্দান্ত বাজে স্বরটা বাংলাদেশের সর্বপ্রধান স্বর হয়ে উঠল। কে জানে হয়তো এইটেই ভালো।'

'কোনটা ভালো?'

'ভালো এই যে, সংসারের আসল জিনিসগুলো হাটোবাটেই চলাফেরা করে বেড়ায়, অথচ বাজে লোকের চোখের ঠোকর খেয়ে খেয়ে মরে না। তার গভীর জানাজানি বিশ্ব-জগতের অন্তরের নাড়ীতে নাড়ীতে—আজ্ঞা বন্যা, আমি তো বকেই চলেছি, তুমি চুপ করে বসে কী ভাবছ বলো তো।'

লাভণ্য চোখ নিচু করে বসে রইল, জবাব করলে না।

অমিত বললে, 'তোমার এই চুপ করে থাকা মেনে মাইনে না দিয়ে আমার সব কথাকে বরখাস্ত করে দেওয়ার মতো।'

লাভণ্য চোখ নিচু করেই বললে, 'তোমার কথা শুনে আমার ভয় হয় মিতা।'

'ভয় কিসের!'

'তুমি আমার কাছে কী যে চাও, আর আমি তোমাকে কতটুকুই বা দিতে পারি, ভেবে পাই নে।'

'কিছু না ভেবেই তুমি দিতে পার, এইটেতেই তো তোমার দানের দাম।'

'তুমি যখন বললে কর্তায়া সম্পত্তি দিয়েছেন, আমার মনটা কেমন করে উঠল। মনে হল, এইবার আমার ধরা পড়বার দিন আসছে।'

'ধরাই তো পড়তে হবে।'

'মিতা, তোমার রুচি, তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহু দূরে পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেব না— না না, কিছু বলো না, আমার কথাটা আগে শোনো। মিনতি করে বলছি, আমাকে বিয়ে করতে চোয়ো না। বিয়ে করে তখন গ্রহি খুলতে গেলে তাতে আরো জট পড়ে যাবে। তোমার

কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ পর্যন্ত চলবে। তুমি কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ে না।'

'বন্যা, তুমি আজকের দিনের ঔদার্যের মধ্যে কালকের দিনের কার্পণ্যের আশঙ্কা কেন তুলছ?'

'মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বলবার জোর দিয়েছ। আজ তোমাকে যা বলছি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জান। মানতে চাও না, পাছে যে রস এখন ভোগ করছ তাতে একটুও খটকা বাধে। তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটোবার জন্যে ফের; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্যেই তুমি এসেছ। বলব ঠিক কথাটা? বিয়েটাকে তুমি মনে মনে জান, যাকে তুমি সর্বদাই বল ভালগার। ওটা বড়ো রেসপেক্টবল; ওটা শাস্ত্রের-দোহাই-পাড়া সেই-সব বিষয়ী লোকের পোষা জিনিস যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্মিণীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠৈসান দিয়ে বসে।'

'বন্যা, তুমি আশ্চর্য নরম সুবে আশ্চর্য কঠিন কথা বলতে পার।'

'মিতা, ভালোবাসার জ্বারে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি, তোমাকে ভালোতে গিয়ে একটুও ফাঁকি যেন না দিই। তুমি যা আছ ঠিক তাই থাকো, তোমার রুচিতে আমাকে যতটুকু ভালো লাগে ততটুকুই লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না— তাতেই আমি খুশি থাকব।'

'বন্যা, এবার তবে আমার কথাটা বলতে দাও। কী আশ্চর্য করেই তুমি আমার চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছ! তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করব না। কিন্তু একটা জায়গায় তোমার ভুল আছে। মানুষের চরিত্র জিনিশটাও চলে। ঘর-পোষা অবস্থায় তার একরকম শিকলি-বাঁধা স্থাবর পরিচয়। তার পরে একদিন ভাগ্যের হঠাৎ এক ঘায়ে তার শিকলি কাটে, সে ছুট দেয় অরণ্যে, তখন তার আর-এক মূর্তি।'

'আজ তুমি তার কোনটা?'

'যেটা আমার বরাবরের সঙ্গে মেলে না সেইটে। এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, সমাজের কাটা খাল বেয়ে বাঁধা ঘাটে, রুচির ঢাকা-লঠন জ্বালিয়ে। তাতে দেখাশোনা হয়, চেনাশোনা হয় না। তুমি নিজেই বলো বন্যা, তোমার সঙ্গেও কি আমার সেই আলাপ?'

লাবণ্য চুপ করে রইল।

অমিত বললে, 'বাইরে বাইরে দুই নরুৎ প্ররম্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ করে চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ— সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, মর্ষের মিল নয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লঠন, দাঁহে এক হয়ে ওঁটার আগুন ওঠে জ্বলে। সে আগুন জ্বলেছে, অমিত রায় বদলে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এইরকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মানা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায় দমকে দমকে; যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদলিয়ে দিয়েছ বন্যা— সেই তালেই তো তোমার সুবে আমার সুবে গাঁথা পড়ল।'

লাবণ্যর চোখের পাতা ভিচ্ছে এল। তবু এ কথা মনে না করে থাকতে পারলে না যে, 'অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উজ্জ্বাস তোলে। সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ। আমাকে ওর প্রয়োজন সেইজন্যেই। যে-সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে জমে আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে।'

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে লাবণ্য হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে কর না যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে শাজাহান খুশি হয়েছিলেন? তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সব চেয়ে বড়ো প্রেমের দান। তাজমহলে শাজাহানের শোক প্রকাশ পায় নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরোছে।'

অমিত বললে, 'তোমার কথায় তুমি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে চমক লাগিয়ে দিচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই কবি।'

'আমি চাই নে কবি হতে।'

'কেন চাও না?'

'জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। স্বগতে যারা উৎসবসভা সাজাবার হুকুম পেয়েছে কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।'

'বন্যা, তুমি কথাকে অস্বীকার করছ? জান না, তোমার কথা আমাকে কেমন করে জাগিয়ে দেয়। তুমি কী করে জানবে তুমি কী বল, আর সে বলার কী অর্থ। আবার দেখছি নিবারণ চক্রবর্তীকে ডাকতে হল। ওর নাম শুন শুন তুমি বিরক্ত হয়ে গেছ। কিন্তু কী করব বলো, ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভাগুরী। নিবারণ এখনো নিজের কাছে নিজে পুরোনো হয়ে যায় নি— ও প্রত্যেক বারেই যে কবিতা লেখে সে ওর প্রথম

কবিতা। সেদিন ওর খাতা খাঁটতে খাঁটতে অস্পন্দিন আগেকার একটা লেখা পাওয়া গেল। বর্নার উপরে কবিতা— কী করে খবর পেয়েছে, শিল্প পাহাড়ে এসে আমার বর্না আমি খুঁজে পেয়েছি। ও লিখেছে—

বর্না, তোমার স্মটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য তারা।

'আমি নিজে যদি লিখতুম, এর চেয়ে স্পষ্টতর করে তোমার বর্ণনা করতে পারতুম না। তোমার মনের মধ্যে এমন একটা স্বচ্ছতা আছে যে, আকাশের সমস্ত আলো সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়। তোমার সব-কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া সেই আলো আমি দেখতে পাই। তোমার মুখে, তোমার হাসিতে, তোমার কথায়, তোমার স্থির হয়ে বসে থাকায়, তোমার রাস্তা দিয়ে চলায়।

আজি মাঝে মাঝে আমার ছায়ারে
দুলায়ে খেলায়ো তারি এক ধারে,
সে ছায়ারি সাথে হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি—
দিয়ে তাতে বাণী যে বাণী তোমার
চিরস্বনী।

'তুমি বর্না, জীবনস্রোতে তুমি যে কেবল চলছ তা নয়, তোমার চলার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বলা। সংসারের যে-সব কঠিন অচল পাথরগুলোর উপর দিয়ে চল তারাও তোমার সংঘাতে সুরে বেজে ওঠে।

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছে কবি।
পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি,
নিঝরিনী—
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।'

লাবণ্য একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, 'যতই আমার আলো থাক্ আর ধ্বনি থাক্, তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে ছায়াকে আমি ধরে রাখতে পারব না।'

অমিত বললে, 'কিন্তু একদিন হয়তো দেখবে, আর-কিছু যদি না থাকে আমার বাণীরূপ রয়েছে।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'কোথায়? নিবারণ চক্রবর্তীর খাতায়?'

'আশ্চর্য কিছুই নেই। আমার মনের নীচের স্তরে যে ধারা বয়, নিবারণের ফোয়ারায় কেমন করে সেটা বেরিয়ে আসে।'

'তা হলে কোনো একদিন হয়তো কেবল নিবারণ চক্রবর্তীর ফোয়ারার মধ্যেই তোমার মনটিকে পাব, আর কোথাও নয়।'

এমন সময় বাসা থেকে লোক এল ডাকতে— খাবার তৈরি।

অমিত চলতে চলতে ভাবতে লাগল যে, 'লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্তই স্পষ্ট করে জানতে চায়। মানুষ স্বভাবত যেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না। লাবণ্য যে কথাটা বললে সেটার তো প্রতিবাদ করতে পারছি নে। অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হয়, কেউ-বা করে জীবনে, কেউ-বা করে রচনায়— জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে অথচ তার থেকে সরতে সরতে, নদী যেমন কেবলই তীর থেকে সরতে সরতে চলে তেমনি। আমি কি কেবলই রচনার দ্রোত নিয়েই জীবন থেকে সরে সরে যাব! এখানেই কি মেয়ে-পুরুষের ভেদ? পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা

করতে, পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিমু। এমন কেন হল? এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে খুব করে মিল সেইখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি, আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে পাওনা সে মিলন নয়, সে মুক্তি।
এ কথাটা ভাবতে অমিতকে পীড়া দিলে, কিন্তু ওর মন এটাকে অস্বীকার করতে পারলে না।

৮

লাবণ্য-তর্ক

যোগমায়া বললেন, 'মা লাবণ্য, তুমি ঠিক বুঝেছ?'

'ঠিক বুঝেছি মা।'

'অমিত ভারি চঞ্চল, সে কথা মানি। সেইজন্যেই ওকে এত স্নেহ করি। দেখো—না, ও কেমনতরো এলোমেলো। হাত থেকে সবই যেন পড়ে পড়ে যায়।'

লাবণ্য একটু হেসে বললে, 'ওঁকে সবই যদি ধরে রাখতেই হত, হাত থেকে সবই যদি খসে খসে না পড়ত, তা হলেই ওঁর ঘটত বিপদ। ওঁর নিয়ম হচ্ছে, হয় উনি পেয়েও পাবেন না, নয় উনি পেয়েই হারাবেন। যেটা পাবেন সেটা যে আবার রাখতে হবে, এটা ওঁর ধাতের সঙ্গে মেল না।'

'সত্যি করে বলি বাছা, ওর ছেলেমানুষি আমার ভারি ভালো লাগে।'

'সেটা হল মায়ের ধর্ম। ছেলেমানুষিতে দায় যত—কিছু সব মায়ের, আর ছেলের দিকে যত—কিছু সব খেলা। কিন্তু আমাকে কেন বলছ, দায় নিতে যে পারে না তার উপরে দায় চাপাতে?'

'দেখছ—না লাবণ্য, ওর অমন দুরন্ত মন আজকাল অনেকখানি যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দেখে আমার বড়ো মায়া করে। যাই বল, ও তোমাকে ভালোবাসে।'

'তা বাসেন।'

'তবে আর ভাবনা কিসের?'

'কর্তামা, ওঁর যেটা স্বভাব তার উপর আমি একটুও অত্যাচার করতে চাই নে।'

'আমি তো এই জানি লাবণ্য, ভালোবাসা খানিকটা অত্যাচার চায়, অত্যাচার করেও।'

'কর্তামা, সে অত্যাচারের ক্ষেত্র আছে; কিন্তু স্বভাবের উপর পীড়ন নয় না। সাহিত্যে ভালোবাসার বই যতই পড়লেম ততই এই কথাটা বার বার আমার মনে হয়েছে, ভালোবাসার ট্র্যাজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি—নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্যে যেখানে ছলুম—যেখানে মনে করি, আপন মনের মতো করে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করব।'

'তা মা, দুহুনকে নিয়ে সংসার পাততে গেলে পরস্পর পরস্পরকে খানিকটা সৃষ্টি না করে নিলে চলেই না। ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে সেই সৃষ্টি সহজ; যেখানে নেই সেখানে হাতুড়ি পিটোতে গিয়ে তুমি যাকে ট্র্যাজেডি বল তাই ঘটে।'

'সংসার পাতবার জন্যেই যে মানুষ তৈরি তার কথা ছেড়ে দাও। সে তো মাটির মানুষ, সংসারের প্রতিদিনের চাপেই তার গড়ন—পিটোন আপনাই ঘটে থাকে। কিন্তু যে মানুষ মাটির মানুষ একেবারেই নয় সে আপনার স্বতন্ত্র কিছুতেই ছাড়তে পারে না। যে মেয়ে তা না বোঝে সে যতই দাবি করে ততই হয় বঞ্চিত, যে পুরুষ তা না বোঝে সে যতই টান—ইচড়া করে ততই আসল মানুষটাকে হারায়। আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই আমরা যাকে পাওয়া বলি সে আর কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে যেরকম পায় সেই আর—কি।'

'তুমি কী করতে চাও লাবণ্য?'

'বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাই নে। বিয়ে সকলের জন্যে নয়। জান কর্তামা, খুঁতখুঁতে মন যাদের তারা মানুষকে খানিক খানিক বাদ দিয়ে দিয়ে বেছে বেছে নেয়। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে স্ত্রী-পুরুষ যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে, মাঝে ফাঁক থাকে না; তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কারবার করতে হয় নিতান্ত নিকটে থেকে। কোনো একটা অংশ ঢাকা রাখবার জো থাকে না।'

'লাবণ্য, তুমি নিজেই জান না। তোমাকে নিতে গেলে কিছুই বাদ দিয়ে নেবার দরকার হবে না।'

'কিন্তু উনি তো আমাকে চান না। যে আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনেই করি নে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অল্পসু কথা কয়ে উঠেছে।

সেই কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন। ঔর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরায়, তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে মেয়ে ঔর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে করলে মানুষকে মনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।'

'তোমার মনে হয়, অমিত তোমার মতো মেয়েকেও সম্পূর্ণ মনে নিতে পারবে না?'

'স্বভাব যদি বদলায় তবে পারবেন। কিন্তু বদলাবেই বা কেন? আমি তো তা চাই নে।'

'তুমি কী চাও?'

'যতদিন পারি নাহয় ঔর কথার সঙ্গে, ঔর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকব। আর, স্বপ্নই বা তাকে বলব কেন? সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। নাহয় সে গুটি থেকে বের হয়ে আসা দু-চার দিনের একটা রঙিন প্রজ্ঞাপতিই হল, তাতে দোষ কী? জগতে প্রজ্ঞাপতি আরকিছুর চেয়ে যে কম সত্য তা জো নয়। নাহয় সে সূর্যোদয়ের আলোতে দেখা দিল আর সূর্যাস্তের আলোতে মরেই গেল, তাতেই বা কী? কেবল এইটুকুই দেখা চাই যে, সেটুকু সময় যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়।'

'সে যেন বুঝলুম, তুমি অমিতর কাছে নাহয় ক্ষণকালের মায়া রূপেই থাকবে। আর নিজে? তুমিও কি বিয়ে করতে চাও না? তোমার কাছে অমিতও কি মায়া?'

লাবণ্য চুপ করে বসে বইল, কোনো জবাব করলে না।

যোগমায়ী বললেন, 'তুমি যখন তর্ক কর তখন বুঝতে পারি তুমি অনেক-বই-পড়া মেয়ে। তোমার মতো করে ভাবতেও পারি নে, কথা কইতেও পারি নে; শুধু তাই নয়, হয়তো কাল্জের বেলাতেও এত শক্ত হতে পারি নে। কিন্তু তর্কের ফাঁকের মধ্যে দিয়েও যে তোমাকে দেখেছি মা। সেদিন রাত তখন বারোটা হবে— দেখলুম, তোমার ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরে গিয়ে দেখি, তোমার টেবিলের উপর নুয়ে পড়ে দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে তুমি কাঁদছ। এ তো ফিলজফি-পড়া মেয়ে নয়। একবার ভাবলুম, সাত্বনা দিয়ে আদি; তার পরে ভাবলুম, সব মেয়েকেই কাঁদবার দিনে কেঁদে নিতে হবে, চাপা দিতে যাওয়া কিছু নয়। এ কথা বুঝি জানি, তুমি সৃষ্টি করতে চাও না, ভালোবাসতে চাও। মন প্রাণ দিয়ে সেবা না করতে পারলে তুমি বাচবে কী করে। তাই তো বলি, ওকে কাছে না পেল তোমার চলবে না। 'বিয়ে করব না' বলে হঠাৎ পণ করে বোসো না। একবার তোমার মনে একটা জেদ চাপলে আর তোমাকে সোজা করা যায় না, তাই ভয় করি।'

লাবণ্য কিছু বললে না, নতমুখে কোলের উপর শাড়ির আঁচলটা চেপে চেপে অনাবশ্যক ভাঁজ করতে লাগল।

যোগমায়ী বললেন, 'তোমাকে দেখে আমার অনেকবার মনে হয়েছে, অনেক পড়ে, অনেক ভেবে তোমাদের মন বেশি সূক্ষ্ম হয়ে গেছে; তোমরা ভিতরে ভিতরে যে-সব ভাব গড়ে তুলেছ আমাদের সংসারটা তার উপযুক্ত নয়। আমাদের সময়ে মনের যে-সব আলো অদৃশ্য ছিল, তোমরা আজ যেন সেগুলোকেও ছাড়ান দিতে চাও না। তারা দেহের মোটা আবরণটাকে ভেদ করে দেহটাকে যেন অগোচর করে দিচ্ছে। আমাদের আমলে মনের মোটা মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারে সুখদুঃখ যথেষ্ট ছিল, সমস্যা কিছু কম ছিল না। আজ তোমরা এতই বাড়িয়ে তুলছ, কিছই আর সহজ রাখলে না!'

লাবণ্য একটুখানি হাসলে। এই সেদিন অমিত অদৃশ্য আলোর কথা যোগমায়াকে বোঝাচ্ছিল, তার থেকে এই যুক্তি তার মাথায় এসেছে— এও তো সূক্ষ্ম; যোগমায়ার মা-ঠাকরুন এ কথা এমন করে বুঝতেন না। বললে, 'কর্তামা, কালের গতিকে মানুষের মন যতই স্পষ্ট করে সব কথা বুঝতে পারবে ততই শক্ত করে তার ধাক্কা সইতেও পারবে। অন্ধকারের ভয়, অন্ধকারের দৃষ্ট অসহ্য, কেননা সেটা অস্পষ্ট।'

যোগমায়ী বললেন, 'আজ আমার বোধ হচ্ছে, কোনো কালে তোমাদের দুজনের দেখা না হলেই ভালো হত।'

'না না, তা বোলো না। যা হয়েছে এ ছাড়া আর-কিছু যে হতে পারত, এ আমি মনেও করতে পারি নে— এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান্তই শূকনো— কেবল বই পড়ব আর পাস করব, এমনি করেই আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলুম, আমিও ভালোবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হল, এই আমার ঢের হয়েছে। মনে হয় এত দিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি। এর চেয়ে আর কী চাই! আমাকে বিয়ে করতে বোলো না কর্তামা।'

বলে চৌকি থেকে মেঝেতে নেমে যোগমায়ার কোলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

বাসা-বদল

গোড়ায় সবাই ঠিক করে রেখেছিল, অমিত দিন-পনেরোর মধ্যে কোলকাতায় ফিরবে। নরেন মিস্ত্রির খুব মোটা বাজি রেখেছিল যে, সাত দিন পেরোবে না। এক মাস যায়, দু মাস যায়, ফেরবার নামও নেই। শিলঙের বাসার মেয়াদ ফুরিয়েছে, রংপুরের কোন্ জমিদার এসে সেটা দখল করে বসল। অনেক বোজ্ঞ করে যোগমায়াদের কাছাকাছি একটা বাসা পাওয়া গেছে। এক সময়ে ছিল গোয়ালার কি মালীর ঘর, তার পরে একজন কেরানির হাতে পড়ে তাতে গরিবি ভদ্রতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল। সে কেরানিও গেছে মরে, তারই বিধবা এটা ভাড়া দেয়। জ্ঞানলা-দরজা প্রভৃতির কার্পণ্যে ঘরের মধ্যে তেজ মরুৎ ব্যোম এই তিন ভুতেরই অধিকার সংকীর্ণ, কেবল বৃষ্টির দিনে অল্প অবতীর্ণ হয় আশাতীত প্রাচ্যের সঙ্গে অখ্যাত ছিদ্রপথ দিয়ে।

ঘরের অবস্থা দেখে যোগমায়া একদিন চমকে উঠলেন। বললেন, 'বাবা, নিজেকে নিয়ে এ কী পরীক্ষা চলেছে?'

অমিত উত্তর করলে, 'উমার ছিল নিরাহারের তপস্যা, শেষকালে পাতা পর্যন্ত ঝাওয়া ছেড়েছিলেন। আমার হল নিরাসবাবের তপস্যা, খাট পালঙ টেবিল কেদারা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় এসে ঠেকেছে শূন্য দেয়ালে। সেটা ঘটেছিল হিমালয় পর্বতে, এটা ঘটল শিলঙ পাহাড়ে। সেটাতে কন্যা চেয়েছিলেন বর, এটাতে বর চাচ্ছেন কন্যা। সেখানে নারদ ছিলেন ঘটক, এখানে স্বয়ং আছেন মাসিমা। এখন শেষ পর্যন্ত যদি কোনো কারণে কালিদাস এসে না পৌঁছতে পারে, অগত্যা আমাদেরই তাঁর কাজটাও যথাসম্ভব সারতে হবে।'

অমিত হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে, কিন্তু যোগমায়াকে ব্যথা দেয়। তিনি প্রায় বলতে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতেই এসে থাকো— থেমে গেলেন। ভাবলেন, ষিধাটা একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তুলছেন, তার মধ্যে আমাদের হাত পড়লে অসাধ্য ক্ষুট পাকিয়ে উঠতে পারে। নিজের বাসা থেকে অল্প কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন, আর সেইসঙ্গে এই লক্ষ্মীছাড়ারটা 'পরে তাঁর করুণা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। লাভগ্যকে বার বার বললেন, 'মা লাভগ্য, মনটাকে পাশাণ করো না।'

একদিন বিষম এক বর্ষশের অন্তে অমিত কেমন আছে খবর নিতে গিয়ে যোগমায়া দেখলেন, নড়বড়ে একটা চারপায়ে টেবিলের নীচে কঞ্চল পেতে অমিত একলা বসে একবানা ইংরেজি বই পড়ছে। ঘরের মধ্যে যেখানে-সেখানে বৃষ্টিবিন্দুর অসংগত আবির্ভাব দেখে টেবিল দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে তার নীচে অমিত পা ছড়িয়ে বসে গেল। প্রথমে নিজে নিজেই হেসে নিলে এক চোট, তার পরে চলল কাব্যালোচনা। মনটা ছুটেছিল যোগমায়ার বাড়ির দিকে। কিন্তু শরীরটা দিলে বাধা। কারণ, যেখানে কোনো প্রয়োজন হয় না সেই কোলকাতায় অমিত কিনেছিল এক অনেক দামের বর্ষাতি, যেখানে সর্বদাই প্রয়োজন সেখানে আসবার সময় সেটা আনবার কথা মনে হয় নি। একটা ছাতা সঙ্গে ছিল, সেটা খুব সম্ভব কোনো একদিন সংকল্পিত গম্যস্থানেই ফেলে এসেছে, আর তা যদি না হয় তবে সেই বুড়ো দেওদারের তলে সেটা আছে পড়ে।

যোগমায়া ঘরে ঢুকে বললেন, 'একি কাণ্ড অমিত !'

অমিত তাড়াতাড়ি টেবিলের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে বললে, 'আমার ঘরটা আজ অসম্বন্ধ প্রলাপে মেতেছে, দশা আমার চেয়ে ভালো নয়।'

'অসম্বন্ধ প্রলাপ !'

'অর্থাৎ বাড়ির চালাটা প্রায় ভারতবর্ষ বললেই হয়। অংশগুলোর মধ্যে সম্বন্ধটা আলগা। এইজন্যে উপর থেকে উৎপাত ঘটলেই চারি দিকে এলোমেলো অশ্রু-বর্ষণ হতে থাকে, আর বাইরের দিক থেকে যদি ঝড়ের দাপট লাগে, তবে সৌ সৌ করে উঠতে থাকে দীর্ঘশ্বাস। আমি তো প্রটেক্ট-স্বরূপে মাথার উপরে এক মঞ্চ বাড়া করেছি— ঘরের মিস্গভর্নামেন্টের মাঝখানেই নিরুপদ্রব হোমরুলের দৃষ্টান্ত। পলিটিক্সের একটা মূলনীতি এখানে প্রত্যক্ষ।'

'মূলনীতিটা কী শুনি।'

'সেটা হচ্ছে এই যে, যে ঘরওয়ানা ঘরে বাস করে না সে যত বড়ো ক্ষমতালালীই হোক, তার শাসনের চেয়ে যে দরিদ্র বাসায় ঘরে থাকে তার যেমন-তেমন ব্যবস্থাও ভালো।'

আজ লাভগ্যর পরে যোগমায়ার খুব রাগ হল। অমিতকে তিনি যতই গভীর করে স্নেহ করছেন ততই মনে মনে তার মৃতিটা খুব উচু করেই গড়ে তুলছেন।— 'এত বিদ্যে, এত বুদ্ধি, এত পাস, অথচ এমন সাদা

মন ! গুছিয়ে কথা বলবার কী অসামান্য শক্তি ! আর, যদি চেহারা কথা বল, আমার চোখে তো লাভণ্যর চেয়ে ওকে অনেক বেশি সুন্দর ঠেকে । লাভণ্যর কপাল ভালো, অমিত কোন গ্রহের চক্রান্তে ওকে এমন মুগ্ধ চোখে দেখেছে ! সেই সোনার চাঁদ ছেলেকে লাভণ্য এত করে দুঃখ দিচ্ছে ! খামকা বলে বসলেন কিনা বিয়ে করবেন না । যেন কোন রাজরাজেশ্বরী ! ধনুক—ভাঙা পণ ! এত অহংকার সহিবে কেন ! পোড়ারমুখীকে যে কৈদে কৈদে মরতে হবে !

একবার যোগমায়া ভাবলেন, অমিতকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাড়িতে । তার পরে কী ভাবে বললেন, 'একটু বোসো বাবা, আমি এখনই আসছি ।'

বাড়ি গিয়েই চোখে পড়ল লাভণ্য তার ঘরের সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের উপর শাল মেলে গোর্কির 'মা' বলে গল্পের বই পড়ছে । ওর এই আরামটা দেখে ওঁর মনে মনে রাগ আরো বেড়ে উঠল ।

বললেন, 'চলো, একটু বেড়িয়ে আসবে ।'

সে বললে, 'কর্তামা, আজ বেরোতে ইচ্ছে করছে না ।'

যোগমায়া ঠিক বুঝলেন না যে, লাভণ্য নিজেই কাছ থেকে ছুটে গিয়ে এই গল্পের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে । সমস্ত দুপুরবেলা ষাওয়ার পর থেকেই, তার মনের মধ্যে একটা অস্থির অপেক্ষা ছিল কখন আসবে অমিত । কেবলই মন বলেছে, এল বুঝি । বাইরে দমকা হাওয়ার দৌরাড্যে পাইন গাছগুলো থেকে থেকে ছটফট করে । আর, দুর্দান্ত বৃষ্টিতে সদ্যোজাত বর্নীগুলো এমনি ব্যতিব্যস্ত যেন তাদের মেয়াদের সময়টার সঙ্গে উর্ধ্বশ্বাসে তাদের পাল্লা চলেছে । লাভণ্যর মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশান্ত হয়ে উঠল— যাক সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুই হাত আজ চেপে ধরে বলে উঠি, জ্বন্দে—জ্বন্দে—আমি তোমার । আজ বলা সহজ । আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হু হু করে কী যে হাঁকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় আজ বন—বনাস্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায়—আবিষ্টি গিরিশঙ্করগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল । অমনি করেই কেউ শুনতে আসুক লাভণ্যর কথা— অমনি মস্ত করে, শুক্ক হয়ে, অমনি উদার মনোযোগে । কিন্তু প্রহরের পর প্রহর যায়, কেউ আসে না । ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল । এর পরে যখন কেউ আসবে তখন কথা ছুটবে না, তখন সংশয় আসবে মনে, তখন তাওবনুতোম্মত দেবতার মাঁভেঃ রব আকাশে মিলিয়ে যাবে । বৎসরের পর বৎসর নীরবে চলে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে এসে আঘাত করে । সেই সময়ে দ্বার খোলবার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল তবে কোনোদিনই ঠিক কথাটি অকুষ্ঠিত স্বরে বলবার দৈবশক্তি আর জোটে না । যেদিন সেই বাণী আসে সেদিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে, শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি । 'আমি ভালোবাসি' এই কথাটি অপরিচিত সিন্দূপারগামী পাখির মতো, কত দিন থেকে, কত দূর থেকে আসছে— সেই কথাটির জন্যই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এতদিন অপেক্ষা করছিলেন । স্পর্শ করল আজ সেই কথাটি— আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হয়ে উঠল । বালিশের মধ্যে মুখ লুকিয়ে লাভণ্য আজ কাকে এমন করে বলতে লাগল 'সত্য সত্য, এত সত্য আর কিছু নেই !

সময় চলে গেল, অতিথি এল না । অপেক্ষার গুরুভারে বৃক্কের ভিতরটা টন টন করতে লাগল, বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে লাভণ্য খানিকটা ভিজে এল জলের ঝাপটা লাগিয়ে । তার পরে একটা গভীর অবসাদে তার মনটাকে ঢেকে ফেললে নিবিড় একটা নৈরাশ্যে; মনে হল ওর জীবনে যা স্থলবার তা একবার মাত্র দপ করে স্থলে তার পরে গেল নিবে, সামনে কিছুই নেই । অমিতকে নিজের ভিতরকার সত্যের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ করে স্বীকার করে নিতে ওর সাহস চলে গেল । এই কিছু আগেই ওর প্রবল যে একটা ভরসা ছেগেছিল সেটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে । অনেকক্ষণ চুপ করে পাড়ে থেকে অবশেষে টেবিল থেকে বইটা টেনে নিলে । কিছু সময় গেল মন দিতে; তার পরে গল্পের ধারার মধ্যে প্রবেশ করে কখন নিজেই ভুলে গেল তা জানতে পারে নি ।

এমন সময় যোগমায়া ডাকলেন, বেড়াতে যেতে । ওর উৎসাহ হল না ।

যোগমায়া একটা চৌকি টেনে লাভণ্যর সামনে বসলেন, দীপ্ত চোখ তার মুখে রেখে বললেন, 'সত্যি করে বলা দেখি লাভণ্য, তুমি কি অমিতকে ভালোবাস ?'

লাভণ্য তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে, 'এমন কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ কর্তামা ?'

'যদি না ভালোবাস ওকে স্পষ্ট করেই বলা—না কেন । নিশ্চয় তুমি, ওকে যদি না চাও তবে ওকে ধরে রেখো না ।'

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠল, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

‘এইমাত্র যে দশা গুর দেখে এলুম, বুক ফেটে যায়। এমন ভিক্ষুকের মতো কার জন্যে এখানে ও পড়ে আছে ! গুর মতো ছেলে যাকে চায় সে যে কত বড়ো ভাগ্যবতী তা কি একটুও বুঝতে পার না?’

চেষ্টা করে রুদ্ধ কণ্ঠের বাধা কাটিয়ে লাবণ্য বলে উঠল, ‘আমার ভালোবাসার কথা ছিঙ্কাসা করছ কর্তামা ? আমি তো ভেবে পাই নে, আমার চেয়ে ভালোবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর—এক আরস্ত, এ আরস্তের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ যে কত আশ্চর্য সে আমি কাউকে কেমন করে জানাব ? আর কেউ কি এমন করে স্বেদনে?’

যোগাম্মা অবাক হয়ে গেলেন। চিরদিন দেখে এসেছেন লাবণ্যর মধ্যে গভীর শান্তি, এত বড়ো দুঃসহ আবেগ কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিল ! তাকে আশ্তে আশ্তে বললেন, ‘মা লাবণ্য, নিজেকে চাপা দিয়ে রেখো না। অমিত অঙ্ককারে তোমাকে ঝুঁজে ঝুঁজে বেড়াচ্ছে, সম্পূর্ণ করে তার কাছে তুমি আপনাকে জানাও—একটুও ভয় করো না। যে আলো তোমার মধ্যে জ্বলছে সে আলো যদি তার কাছেও প্রকাশ পেত তা হলে তার কোনো অভাব থাকত না। চলো মা, এখনই চলো আমার সঙ্গে।’

দুজনই গেলেন অমিতর বাসায়।

১০

দ্বিতীয় সাধনা

তখন অমিত ভিজে চৌকির উপরে একতড়া খবরের কাগজ চাপিয়ে তার উপর বসেছে। টেবিলে এক দিশে ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিয়ে তার চলছে লেখা। সেই সময়েই সে তার বিখ্যাত আত্মজীবনী শুরু করেছিল। কারণ ছিঙ্কাসা করলে বলে, সেই সময়েই তার জীবনটা অকস্মাৎ তার নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নানা রঙে, বাদলের পরদিনকার সকালবেলায় শিলঙ পাহাড়ের মতো; সেদিন নিজের অস্তিত্বের একটা মূল্য সে পেয়েছিল, সে কথাটা প্রকাশ না করে সে থাকবে কী করে ? অমিত বলে, মানুষের মৃত্যুর পরে তার জীবনী লেখা হয় তার কারণ, এক দিকে সংসারে সে মরে, আর—এক দিকে মানুষের মনে সে নিবিড় করে বেঁচে ওঠে। অমিতর ভাবখানা এই যে, শিলঙে সে যখন ছিল তখন এক দিকে সে মরেছিল, তার অতীতটা গিয়েছিল মরীচিকার মতো মিলিয়ে, তেমনি আর—এক দিকে সে উঠেছিল তীব্র করে বেঁচে; পিছনের অঙ্ককারের উপরে উজ্জ্বল আলোর ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রকাশের খবরটা রেখে যাওয়া চাই। কেননা, পৃথিবীতে খুব অল্প লোকের ভাগ্যে এটা ঘটতে পারে, তারা জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটা প্রদোষছায়ার মধ্যেই কাটিয়ে যায়, যে বাদুড় গৃহর মধ্যে বাসা করেছে তারই মতো।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, ঝোড়ো হাওয়াটা চাছে থেমে, মেঘ এসেছে পাতলা হয়ে।

অমিত চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ‘এ কী অন্যায় মাসিমা !’

‘কেন বাবা, কী করেছি?’

‘আমি যে একেবারে অপ্রস্তুত। শ্রীমতী লাবণ্য কী ভাববেন !’

‘শ্রীমতী লাবণ্যকে একটু ভাবতে দেওয়াই তো দরকার। যা জানবার সবটাই যে জানা ভালো। এতে শ্রীমুন্ড অমিতের এত আশঙ্কা কেন?’

‘শ্রীমুন্ডের যা ঐশ্বর্য সেইটেই শ্রীমতীর কাছে জানাবার। আর, শ্রীহীনের যা দৈন্য সেইটে জানাবার জন্যেই আছ তুমি, আমার মাসিমা।’

‘এমন ভেদবুদ্ধি কেন বাছা?’

‘নিজের গরজেই। ঐশ্বর্য দিয়েই ঐশ্বর্য দাবি করতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্বাদ। মানবসভ্যতায় লাবণ্যদেবীরা জাগিয়েছেন ঐশ্বর্য, আর মাসিমারা এনেছেন আশীর্বাদ।’

‘দেবীকে আর মাসিমাতে একাধারেই পাওয়া যেতে পারে অমিত; অভাব ঢাকবার দরকার হয় না।’

‘এর জ্বাব কবির ভাষায় দিতে হয়। গদ্যে যা বলি সেটা স্পষ্ট বোঝাবার জন্যে ছন্দের ভাষা দরকার হয়ে পড়ে। ম্যাথু আর্নল্ড কাব্যকে বলেছেন ক্রিটিসিজম অফ লাইফ, আমি কথাটাকে সংশোধন করে বলতে চাই

লাইফস্ কম্ফোর্টারি ইন ভার্স। অতিথিবিশেষকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখি, যেটা পড়তে যাচ্ছে সে লেখাটা কোনো কবিসম্মেলনের নয়।—

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা

সিক্ত হাতে চাস নে তারে,

সিক্ত চোখে হাস নে ছারে।

ভেবে দেখবেন, ভালোবাসাই হচ্ছে পূর্ণতা, তার যা আকাঙ্ক্ষা সে তো দরিরদ্রের কাঙ্ক্ষালপনা নয়। দেবতা যখন তাঁর ভক্তকে ভালোবাসেন তখনই আসেন ভক্তের দ্বারে ভিক্ষা চাইতে।—

রত্নমালা আনবি যবে

মাল্য-বদল তখন হবে,

পাতবি কি তোর দেবীর আসন

শূন্য ধুলায় পথের ধারে ?

সেইজন্যেই তো সম্প্রতি দেবীকে একটু হিসেব করে ঘরে ঢুকতে বলেছিলুম। পাতবার কিছুই নেই তো পাতব কী ? এই ভিচ্ছে খবরের কাগজগুলো ? আজকাল সম্পাদকি কালির দাগকে সব চেয়ে ভয় করি। কবি বলছেন, ডাকবার মানুষকে ডাকি যখন জীবনের পেয়লা উছলে পড়ে, তাকে তৃষ্ণার শরিক হতে ডাকি নে।—

পুষ্প-উদার চৈত্রবনে

বস্কে ধরিস নিত্য-ধনে

লক্ষ শিখায় স্ফলবে যখন

দীপ্ত প্রদীপ অঙ্ককারে।

মাসিদের কোলে জীবনের আরম্ভেই মানুষের প্রথম তপস্যা দারিদ্র্যের, নগ্ন সন্ন্যাসীর স্নেহসাধনা। এই কুটিরের তারই কঠোর আয়োজন। আমি তো ঠিক করে রেখেছি, এই কুটিরের নাম দেব মাসতুতো বাংলা।

'বাবা, জীবনের দ্বিতীয় তপস্যা ঐশ্বর্যের, দেবীকে বা পাশে নিয়ে শ্রেমসাধনা। এ কুটিরেরও তোমার সে সাধনা ভিচ্ছে কাগজে চাপা পড়বে না। 'বর পাই নি' বলে নিজেকে ভোলাচ্ছ ? মনে মনে নিশ্চয়ই জান, পেয়েছ।'

এই বলে লাভণ্যকে অমিতর পাশে দাঁড় করিয়ে তার জান হাত অমিতর জান হাতের উপর রাখলেন। লাভণ্যর গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দুজনের হাত বেঁধে বললেন, 'তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক।'

অমিত লাভণ্য দুজনে মিলে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। তিনি বললেন, 'তোমরা একটু বোসো, আমি বাগান থেকে কিছু ফুল নিয়ে আসি গে।'

বলে গাড়ি করে ফুল আনতে গেলেন। অনেকক্ষণ দুজনে খাটিয়াটার উপরে পাশাপাশি চুপ করে বসে রইল। এক সময়ে অমিতর মুখের দিকে মুখ তুলে লাভণ্য মৃদুস্বরে বললে, 'আজ তুমি সমস্ত দিন গেলে না কেন ?'

অমিত উত্তর দিলে, 'কারণটা এত বেশি তুচ্ছ যে আজকের দিনে সে কথাটা মুখে আনতে সাহসের দরকার। ইতিহাসে কোনোখানে লেখে না যে, হাতের কাছে বর্ষাতি ছিল না বলে বাদলের দিনে শ্রেমিক তার প্রিয়র কাছে যাওয়া মূলতবি রেখেছে; বরঞ্চ লেখা আছে সঁতার দিয়ে অগাধ স্ফল পার হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা অন্তরের ইতিহাস, সেখানকার সমুদ্রে আমিও কি সঁতার কাটছি নে ভাবছ ? সে অকূল কোনোকালে কি পার হব ?—

For we are bound where
mariner has not yet dared to go,
And we will risk the ship,
ourselves and all.

আমরা যাব যেখানে কোনো
যায় নি নেয়ে সাহস করি।

ডুবি যদি তো ডুবি-না কেন,
ডুবুক সব, ডুবুক তরী।

বন্যা, আমার জন্যে আজ তুমি অপেক্ষা করে ছিলে ?'

‘হাঁ মিতা, বৃষ্টির শব্দে সমস্ত দিন যেন তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি। মনে হয়েছে, কত অসম্ভব দূর থেকে যে আসছে তার ঠিক নেই। শেষকালে তো এসে পৌঁছলে আমার জীবনে।’

‘বন্যা, আমার জীবনের মাঝখানটিতে ছিল এককাল তোমাকে—না-জানার একটা প্রকাণ্ড কালো গর্ত। ঐখানটা ছিল সব চেয়ে কুশ্রী। আঙ্গ সেটা কানা ছাপিয়ে ভরে উঠল— তারই উপরে আলো ঝলমল করে, সমস্ত আকাশের ছায়া পড়ে, আঙ্গ সেইখানটাই হয়েছে সব চেয়ে সুন্দর। এই যে আমি ক্রমাগতই কথা কয়ে যাচ্ছি, এ হচ্ছে ঐ পরিপূর্ণ প্রাণসরোবরের তরঙ্গধ্বনি; একে থামায় কে?’

‘মিতা, তুমি আঙ্গ সমস্ত দিন কী করছিলে?’

‘মনের মাঝখানটাতে তুমি ছিলে, একেবারে নিস্তব্ধ। তোমাকে কিছু বলতে চাচ্ছিলুম, কোথায় সেই কথা? আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে আর আমি কেবলই বলেছি, কথা দাও, কথা দাও!—

O what is this?

Mysterious and uncapturable bliss
That I have known, yet seems to be
Simple as breath and easy as a smile.
And older than the earth.

একি রহস্য, একি আনন্দরাশি।

জেনেছি তাহারে, পাই নি তবুও পেয়ে।

তবু সে সহজে প্রাণে উঠে নিশ্বাসি,

তবু সে সরল যেন রে সরল হাসি—

পুরানো সে যেন এই ধরণীর চেয়ে।

বসে বসে ঐ করি। পরের কথাকে নিজের কথা করে তুলি। সুর দিতে পারতুম যদি তবে সুর লাগিয়ে বিদ্যাপতির বর্ষার গানটাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতুম—

বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি

হরি বিনে দিন রাতিয়া।

যাকে না হলে চলে না তাকে না পেয়ে কী করে দিনের পর দিন কাটবে, ঠিক এই কথাটার সুর পাই কোথায়? উপরে চেয়ে কখনো বলি ‘কথা দাও’ কখনো বলি ‘সুর দাও’। কথা নিয়ে সুর নিয়ে দেবতা নেমেও আসেন, কিন্তু পথের মধ্যে মানুষ ভুল করেন, খামকা আর-কাউকে দিয়ে বসেন— হয়তো-বা তোমাদের ঐ রবি ঠাকুরকে।’

লাবণ্য হেসে বললে, ‘রবি ঠাকুরকে যারা ভালোবাসে তারাও তোমার মতো এত বার বার করে তাঁকে স্মরণ করে না।’

‘বন্যা, আঙ্গ আমি বড়ো বেশি বকছি, না? আমার মধ্যে বকুনির মনসুন নেমেছে। গুয়েদার-রিপোর্ট যদি রাখ তো দেখবে এক-এক দিনে কত ইঞ্চি পাগলামি তার ঠিকানা নেই। কোলকাতায় যদি থাকতুম তোমাকে নিয়ে টায়ার ফাটাতে ফাটাতে মোটরে করে একেবারে মোরাদাবাদে দিতুম দৌড়। যদি জিজ্ঞাসা করতে মোরাদাবাদে কেন, তার কোনোই কারণ দেখাতে পারতুম না। বান যখন আসে তখন সে বকে, ছোট্টে, সময়টাকে হাসতে হাসতে ফেনার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।’

এমন সময় ডালিতে ভরে যোগমায়া সূর্যমুখী ফুল আনলেন। বললেন, ‘মা লাবণ্য, এই ফুল দিয়ে আঙ্গ তুমি ওকে প্রণাম করো।’

এটা আর কিছু নয়, একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রাণের ভিতরকার জিনিসকে বাইরে শরীর দেবার মেয়েলি চেষ্টা। দেহকে বানিয়ে তোলবার আকাশকাণ্ডাদের রক্তে মাংসে।

আঙ্গ কোনো-এক সময়ে অমিত লাবণ্যকে কানে কানে বললে, ‘বন্যা, একটি আংটি তোমাকে পরাতে চাই।’

লাবণ্য বললে, ‘কী দরকার মিতা!’

‘তুমি যে আমাকে তোমার এই হাতখানি দিয়েছ সে কতখানি দেওয়া তা ভেবে শেষ করতে পারি নে। কবির প্রিয়ার মুখ নিয়েই যত কথা কয়েছে। কিন্তু হাতের মধ্যে প্রাণের কত ইশারা; ভালোবাসার যত-কিছু

আদর, যত-কিছু সেবা, হৃদয়ের যত দরদ, যত অনির্বচনীয় ভাষা, সব যে ঐ হাতে। আংটি তোমার আঙুলটিকে জড়িয়ে থাকবে আমার মুখের ছোটো একটি কণ্ঠার মতো; সে কথ্যটি শুধু এই 'পেয়েছি'। আমার এই কথাটি সোনার ভাষায়, মানিকের ভাষায় তোমার হাতে থেকে যাক-না।'

লাবণ্য বললে, 'আচ্ছা, তাই থাক!'

'কোলকাতা থেকে আনতে দেব, বলে কোন্ পাথর তুমি ভালোবাস।'

'আমি কোনো পাথর চাই নে, একটি মাত্র মুক্তো থাকলেই হবে।'

'আচ্ছা, সেই ভালো। আমিও মুক্তো ভালোবাসি।'

১১

মিলনতত্ত্ব

ঠিক হয়ে গেল আগামী অম্বান মাসে এদের বিয়ে। যোগমায়া কোলকাতায় গিয়ে সমস্ত আয়োজন করবেন।

লাবণ্য অমিতকে বললে, 'তোমার কোলকাতায় ফেরবার দিন অনেক কাল হল পেরিয়ে গেছে। অনিশ্চিতের মধ্যে বাঁধা পড়ে তোমার দিন কেটে যাচ্ছিল। এখন ছুটি নিঃসংশয়ে চলে যাও। বিয়ের আগে আমাদের আর দেখা হবে না।'

'এমন কড়া শাসন কেন?'

'সেদিন যে সহজ্ঞ আনন্দের কথা বলেছিলে তাকে সহজ্ঞ রাখবার জন্যে।'

'এটা একেবারে গভীর ধ্যানের কথা। সেদিন তোমাকে কবি বলে সন্দেহ করেছিলুম, আজ সন্দেহ করছি ফিলজফার বলে। চমৎকার বলেছ। সহজ্ঞকে সহজ্ঞ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়। ছন্দকে সহজ্ঞ করতে চাও তো যতিকে ঠিক জায়গায় কমে আঁটতে হবে। লোভ বেশি, তাই জীবনের কাব্যে কোথাও যতি দিতে মন সরে না, ছন্দ ভেঙে গিয়ে জীবনটা হয় গীতহীন বন্ধন। আচ্ছা, কালই চলে যাবে, একেবারে হঠাৎ এই ডরা দিনগুলোর মাঝখানে। মনে হবে, যেন মেঘনাদবধ-কাব্যের সেই চমকে-খেমে-যাওয়া লাইনটা—

চলি যাবে গেলা যমপুরে

অকালে!

শিল্প থেকে আমিই নাহয় চললুম, কিন্তু পাজি থেকে অম্বান মাস তো ফস করে পালাবে না। কোলকাতায় গিয়ে কী করব জান?'

'কী করবে।'

'মাসিমা যতক্ষণ করবেন বিয়ের দিনের ব্যবস্থা ততক্ষণ আমাকে করতে হবে তার পরের দিনগুলোর আয়োজন। লোকে ভুলে যায় দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন গুকে নতুন করে সৃষ্টি করা চাই। মনে আছে বন্যা, রঘুবংশে অঙ্ক-মহারাজা ইন্দুমতীর কী বর্ণনা করেছিলেন?'

লাবণ্য বললে, 'প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।'

অমিত বললে, 'সেই ললিতকলাবিধিটা দাম্পত্যেরই। অধিকাংশ বর্বর বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেইজন্যে তার পর থেকে মিলনটাকে এত অবহেলা।'

'মিলনের আর্ট তোমার মনে কিরকম আছে বুঝিয়ে দাও। যদি আমাকে শিখ্যা করতে চাও আজই তার প্রথম পাঠ শুরু হোক।'

'আচ্ছা, তবে শোনো। ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর করতে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায়, দামি জিনিসকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো। কেননা, শক্ত করে দাম দেওয়ার আন্দটা বড়ো কম নয়।'

'দামের হিসাবটা শুনি।'

'রোসো, তার আগে আমার মনে যে ছবিটা আছে বলি। গঙ্গার ধার, বাগানটা ডায়মন্ড হারবারের ঐদিকটাতে। ছোটো একটি স্টীম লঞ্চ করে ষ্টা-দুয়েকের মধ্যে কোলকাতায় যাতায়াত করা যায়।'

'আবার কোলকাতায় কী দরকার পড়ল?'

'এখন কোনো দরকার নেই সে কথা জান। যাই বটে বার-লাইব্রেরিতে— ব্যাবসা করি নে, দাবা খেলি। অ্যাটর্নিরা বুকে নিয়েছে, কাজে গরজ নেই, তাই মন নেই। কোনো আপসের মকদ্দমা হলে তার ব্রীফ আমাকে

দেয়, তার বেশি আর কিছুই দেয় না। কিন্তু বিয়ের পরেই দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে— জীবিকার দরকারে নয়, জীবনের দরকারে। আমার মাঝখানটাতে থাকে আঠি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরমও নয়, স্বাদ্যও নয়; কিন্তু ঐ শক্তটাই সমস্ত আমার আশ্রয়, ঐটেতেই সে আকার পায়। কোলকাতার পাথুরে আঠিটাকে কিসের জন্য দরকার বুঝেছ তো? মথুরের মাঝখানে একটা কঠিনকে রাখবার জন্যে।

‘বুঝেছি। তা হলে দরকার তো আমারও আছে। আমাকেও কোলকাতায় যেতে হবে— দশটা-পাঁচটা।’

‘দোষ কী? কিন্তু পাড়া-বেড়াতে নয়, কাজ করতে।’

‘কিসের কাজ বলে। বিনা মাইনেয়?’

‘না না, বিনা মাইনের কাজ কাজও নয় ছুটিও নয়, বারোআনা ফাঁকি। ইচ্ছে করলেই তুমি মেয়ে-কলেজে প্রোফেসরি নিতে পারবে।’

‘আচ্ছা, ইচ্ছে করব। তার পর?’

‘স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, গঙ্গার ধার; পাড়ির নীচে-তলা থেকে উঠেছে ঝুরি-নামা অতি পুরোনো বটগাছ। ধনপতি যখন গঙ্গা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিল তখন হয়তো এই বটগাছে নৌকো বেঁধে গাছতলায় রান্না চড়িয়েছিল। ওরই দক্ষিণ ধারে ছ্যাংলা-পড়া ঝাধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল-ধরা, কিছু কিছু ধসে-যাওয়া। সেই ঘাটে সবুজ-সাদায়-রঙ-করা আমাদের ছিপছিপে নৌকোখানি। তারই নীল নিশানে সাদা অক্ষরে নাম লেখা। কী নাম বলে দাও তুমি।’

‘বনব? মিতালি!’

‘ঠিক নামটি হয়েছে, মিতালি। আমি ভেবেছিলুম সাগরী, মনে একটু গর্বও হয়েছিল; কিন্তু তোমার কাছে হার মানতে হল। ... বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু একটি খাড়ি চলে গেছে, গঙ্গার জ্বলস্পন্দন বয়ে। তার ও পারে তোমার বাড়ি, এ পারে আমার।’

‘রোজই কি সাঁতার দিয়ে পার হবে, আর জানলায় আমার আলো স্থালিয়ে রাখব?’

‘দেব সাঁতার মনে মনে, একটা কাঠের সাঁকোর উপর দিয়ে। তোমার বাড়িটির নাম মানসী, আমার বাড়ির একটা নাম তোমাকে দিতে হবে।’

‘দীপক।’

‘ঠিক নামটি হয়েছে। নামের উপযুক্ত একটি দীপ আমার বাড়ির চুড়ায় বসিয়ে দেব, মিলনের সন্ধেবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল। কোলকাতা থেকে ফিরে এসে রোজ তোমার কাছ থেকে একটি চিঠি আশা করব। এমন হওয়া চাই, সে চিঠি পেতেও পারি, না পেতেও পারি। সন্ধে আটটার মধ্যে যদি না পাই তবে হতবিক্ষিকে অভিসম্পাত দিয়ে বার্ট্রান্ড রাসেলের লজ্জিক পড়বার চেষ্টা করব। আমাদের নিয়ম হচ্ছে, অনাহৃত তোমার বাড়িতে কোনোমতেই যেতে পারব না।’

‘আর তোমার বাড়িতে আমি?’

‘ঠিক এক নিয়ম হলেই ভালো হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিয়মের ব্যতিক্রম হলে সেটা অসহ্য হবে না।’

‘নিয়মের ব্যতিক্রমটাই যদি নিয়ম না হয়ে ওঠে তা হলে তোমার বাড়িটার দশা কী হবে ভেবে দেখে বরফ আমি বুরকা পরে যাব।’

‘তা হোক, কিন্তু আমার নিমন্ত্রণ-চিঠি চাই। সে চিঠিতে আর-কিছু থাকবার দরকার নেই, কেবল কোনো-একটা কবিতা থেকে দুটি-চারটি লাইন মাত্র।’

‘আর আমার নিমন্ত্রণ বৃষ্টি বন্ধ? আমি একঘরে?’

‘তোমার নিমন্ত্রণ মাসে একদিন, পূর্ণিমার রাতে; চোদ্দটা তিথির ঋগুতা যেদিন চরম পূর্ণ হয়ে উঠবে।’

‘এইবার তোমার প্রিয়শিষ্যকে একটি চিঠির নমুনা দাও।’

‘আচ্ছা বেশ।’ পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে তার পাতা ছিড়ে লিখলে—

Blow gently over my garden
Wind of the southern sea.
In the hour my love cometh
And calleth me.

চুমিয়া যেয়ো ভূমি
আমার বনভূমি,

দবিন-সাগরের সমীরণ,
যে শুভবনে মম
আসিবে প্রিয়তম—
ডাকিবে নাম ধরে অকারণ।

লাবণ্য কাগজখানা ফিরিয়ে দিলে না।

অমিত বললে, 'এবারে তোমার চিঠির নমুনা দাও, দেখি তোমার শিক্ষা কত দূর এগোল।'
লাবণ্য একটা টুকরো কাগজে লিখতে যাচ্ছিল। অমিত বললে, 'না, আমার এই নোটবইয়ে লেখো।'
লাবণ্য লিখে দিলে—

মিতা, তুমিসি মম জীবনং, তুমিসি মম ভূষণং,
তুমিসি মম ভবজলধিরভূম।

অমিত বইটাকে পাকেটে পুরে বললে, 'আশ্চর্য এই, আমি লিখেছি মেয়ের মুখের কথা, তুমি লিখেছ পুরুষের। কিছুই অসংগত হয় নি। শিমুলকাঠই হোক আর বকুলকাঠই হোক, যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারাটা একই।'

লাবণ্য বললে, 'নিমন্ত্রণ তো করা গেল, তার পরে?'

অমিত বললে, 'সন্ধ্যাতারা উঠেছে, জোয়ার এসেছে গঙ্গায়, হাওয়া উঠল ঝির ঝির করে ঝাউগাছগুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠল স্রোতের ছল্‌ছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদিশি, সেইখানে ঝিড়কির নির্জন ঘাটে গা ধুয়ে চুল বেঁধেছ। তোমার এক-একদিন এক-এক রঙের কাপড়, ভাবতে ভাবতে যাব আজকে সন্কেবেলার রঙটা কী? মিলনের জায়গারও ঠিক নেই, কোনোদিন শান-বাঁধানো ঠাপাতলায়, কোনোদিন বাড়ির ছাতে, কোনোদিন গঙ্গার ধারের চাতালে। আমি গঙ্গায় স্নান সেরে সাদা মলমলের ধুতি আর চাদর পরব, পায়ে থাকবে হাতির দাঁতে কাজ করা খড়ম। গিয়ে দেখব, গালচে বিছিয়ে বসেছ, সামনে রূপোর রেকাবিতে মোটা গোড়ে মালা, চন্দনের বাটিতে চন্দন, এক কোণে জ্বলছে ধূপ।... পুঞ্জের সময় অন্তত দু মাসের জন্যে দুজনে বেড়াতে বেরোব। কিন্তু দুজনে দু জায়গায়। তুমি যদি যাও পর্বতে আমি যাব সমুদ্রে।— এই তো আমার দাম্পত্য-দৈরাজ্যের নিয়মাবলী তোমার কাছে দাখিল করা গেল! এখন তোমার কী মত?'

'মেনে নিতে রাখি আছি।'

'মেনে নেওয়া, আর মনে নেওয়া, এই দুইয়ের যে তফাত আছে বন্যা।'

'তোমার যাতে প্রয়োজন আমার তাতে প্রয়োজন নাও যদি থাকে, তবু আপত্তি করব না।'

'প্রয়োজন নেই তোমার?'

'না, নেই। তুমি আমার যতই কাছে থাক তবু আমার থেকে তুমি অনেক দূরে। কোনো নিয়ম দিয়ে সেই দূরত্বটুকু বজায় রাখা আমার পক্ষে বাহুল্য। কিন্তু আমি জানি, আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমার কাছের দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সহিতে পারবে, সেইজন্যে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল করে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।'

অমিত চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার কাছে আমি হার মানতে পারব না বন্যা, যাক গে আমার বাগানটা। কোলকাতার বাইরে এক পা নড়ব না। নিরঞ্জনদের আপিসের উপরের তলায় পাঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নেব। সেইখানে থাকবে তুমি, আর থাকব আমি। চিদাকাশে কাছে-দূরে ভেদ নেই। সাড়ে তিন হাত চওড়া বিহানায় ঝাঁপাশে তোমার মহল মানসী, ডান পাশে আমার মহল দীপক। ঘরের পূব দেওয়ালে একখানা আমনাওয়লা দেওয়াল, তাতেই তোমারও মুখ দেখা আর আমারও। পশ্চিম দিকে থাকবে বইয়ের আলমারি, পিঠ দিয়ে সেটা রোদদুর ঠেকাবে আর সামনের দিকে সেটাতে থাকবে দুটি পাঠকের একটিমাত্র সারক্যুলেটিং লাইব্রেরি। ঘরের উত্তর দিকটাতে একখানি সোফা, তারই ঝাঁপাশে একটু জায়গা খালি রেখে আমি বসব এক প্রান্তে, তোমার কাপড়ের আলনার আড়ালে তুমি দাঁড়াবে— দু হাত তফাতে। নিমন্ত্রণের চিঠিখানা উপরের দিকে তুলে ধরব কস্পিত হস্তে, তাতে লেখা থাকবে—

ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে

ওগো দক্ষিণ হাওয়া,

শ্রেয়সীর সাথে যে নিমেষে হবে
চারি চক্ষুতে চাওয়া ।

এটা কি খারাপ শোনাচ্ছে বন্যা ?'

'কিছু না মিতা। কিন্তু, এটা সংগ্রহ হল কোথা থেকে ?'

'আমার বন্ধু নীলমাধবের খাতা থেকে। তার ভাবী বধু তখন অনিশ্চিত ছিল। তাকে উদ্দেশ্য করে ঐ ইংরেজি কবিতাটাকে কোলকাতাই ছাচে ঢালাই করেছিল, আমিও সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম। ইকনমিক্সে এম.এ. পাস করে পনেরো হাজার টাকা নগদ পণ আর আশি ভরি গয়না-সমেত নববধুকে লোকটা ঘরে আনলে, চার চক্ষে চাওয়াও হল, দক্ষিণে বাতাসও বয়, কিন্তু ঐ কবিতাটাকে আর ব্যবহার করতে পারলে না। এখন তার অপর শরিককে কাব্যটির সর্বস্বত্ব সমর্পণ করতে বাধ্য হবে না।'

'তোমারও ছাদে দক্ষিণে বাতাস বইবে, কিন্তু তোমার নববধু কি চিরদিনই নববধু থাকবে ?'

টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈশ্বরে অমিত বললে, 'থাকবে, থাকবে, থাকবে।'

যোগমায়া পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী থাকবে অমিত ? আমার টেবিলটা বোধ হচ্ছে থাকবে না।'

'জগতে যা-কিছু টেকসই সবই থাকবে। সংসারে নববধু দুর্লভ, কিন্তু লাখের মধ্যে একটি যদি দৈবাৎ পাওয়া যায় সে চিরদিনই থাকবে নববধু।'

'একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।'

'একদিন সময় আসবে, দেখাব।'

'বোধ হচ্ছে তার কিছু দেরি আছে, ততক্ষণ খেতে চলো।'

১২

শেষ সঙ্খ্যা

আহার শেষ হল অমিত বললে, 'কাল কোলকাতায় যাচ্ছি মাসিমা। আমার আত্মীয়স্বজন সবাই সন্দেহ করছে আমি খাসিয়া হয়ে গেছি।'

'আত্মীয়স্বজনরা কি জানে কথায় কথায় তোমার এত বদল সম্ভব ?'

'খুব জানে, নইলে আত্মীয়স্বজন কিসের ? তাই বলে কথায় কথায় নয়, আর খাসিয়া হওয়া নয়; যে বদল আজ আমার হল এ কি স্বাভাবিক, এ যে যুগ-বদল, তার মাঝখানে একটা কল্পাস্ত। প্রজাপতি জেগে উঠেছেন আমার মধ্যে এক নূতন সৃষ্টিতে। মাসিমা, অনুমতি দাও, লাভগ্যকে নিয়ে আজ একবার বেড়িয়ে আসি। যাবার আগে শিলঙ পাহাড়কে আমাদের যুগল প্রণাম জানিয়ে যেতে চাই।'

যোগমায়া সম্মতি দিলেন। কিছু দূরে যেতে যেতে দুজনের হাত মিলে গেল, ওরা কাছে কাছে এল খেঁষে। নির্জন পথের ধারে নীচের দিকে চলেছে ঘন ঘন। সেই বনের একটা জায়গায় পড়েছে ফাঁক, আকাশ সেখানে পাহাড়ের নজরবন্দি থেকে একটুখানি ছুটি পেয়েছে; তার অঞ্জলি ভরিয়ে নিয়েছে অন্ত-সূর্যের শেষ আভাষ। সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজনে দাঁড়াল। অমিত লাভগ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরলে। লাভগ্যর চোখ অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পাল্লা-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে সেই অমর্তজগতের অব্যক্তধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হল ঘন। সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো, নানা রঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিলে।

অমিতর বুকের কাছ থেকে লাভগ্য মৃদুস্বরে বললে, 'চলো এবার।'

কেমন তার মনে হল, এইখানে শেষ করা ভালো।

অমিত সেটা বুঝলে, কিছু বললে না। লাভগ্যর মুখ বুকের উপর একবার চেপে ধরে ফেরবার পথে খুব ধীরে ধীরে চলল। বললে, 'কাল সকালেই আমাকে ছাড়তে হবে, তার আগে আর দেখা করতে আসব না।'

'কেন আসবে না?'

'আজ ঠিক জাগায় আমাদের শিল্প পাহাড়ের অধ্যায়টি এসে থামল— ইতি প্রথমঃ সর্গঃ, আমাদের সঙ্গে ব্যয়ে স্বর্গ।'

লাবণ্য কিছু বললে না, অমিতর হৃত ধরে চলল। বৃকের ভিতর আনন্দ, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা কারা স্তম্ভ হয়ে আছে। মনে হল, জীবনে কোনোদিন এমন নিবিড় করে অভাবনীয়ক এত কাছে পাওয়া যাবে না। পরমক্ষণে শুভদৃষ্টি হল, এর পরে আর কি বাসরঘর আছে? রইল কেবল মিলন আর বিদায় একত্র মিশিয়ে একটি শেষ প্রণাম। ভারি ইচ্ছে করতে লাগল অমিতকে এখনই সেই প্রণামটি করে বলে, 'তুমি আমাকে ধন্য করেছ।' কিন্তু সে আর হল না।

বাসার কাছাকাছি আসতেই অমিত বললে, 'বন্যা, আজ তোমার শেষ কথাটি একটি কবিতায় বলা, তা হলে সেটা মনে করে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। তোমার নিজের যা মনে আছে এমন একটা—কিছু আমাকে শুনিয়ে দাও।'

লাবণ্য একটুখানি ভেবে আবৃত্তি করলে—

'তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর স্তম্ভ অবসানে। কিছু আর নাই বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মূহূর্তের দৈন্যরাশি,
নাই অভিমান, নাই দীন কাম্মা, নাই গর্বহাসি,
নাই পিছু-ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালাখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।'

'বন্যা, বড়ো অন্যায় করলে। আজকের দিনে তোমার মুখে বলবার কথা এ নয়, কিছুতেই নয়। কেন এটা তোমার মনে এল? তোমার এ কবিতা এখনই ফিরিয়ে নাও।'

'ভয় কিসের মিতা? এই আশুনে-পোড়া প্রেম এ সুখের দাবি করে না, এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আসে না, ম্লানতা আসে না; এর চেয়ে আর কিছু কি দেবার আছে?'

'কিন্তু আমি জানতে চাই, এ কবিতা তুমি পেল কোথায়?'

'রবি ঠাকুরের।'

'তার তো কোনো বইয়ে এটা দেখি নি।'

'বইয়ে বেরোয় নি।'

'তবে পেল কী করে?'

'একটি ছেলে ছিল, সে আমার বাবাকে গুরু বলে ভক্তি করত, বাবা দিয়েছিলেন তাকে তার জ্ঞানের খাদ্য। এ দিকে তার হৃদয়টিও ছিল তাপস। সময় পেলই সে যেত রবি ঠাকুরের কাছে, তাঁর স্বাভা থেকে মুষ্টিভিক্ষা করে আনত।'

'আর নিয়ে এসে তোমার পায়ে দিত।'

'সে সাহস তার ছিল না। কোথাও রেখে দিত, যদি আমার দৃষ্টিতে পড়ে, যদি আমি তুলে নিই।'

'তাকে দয়া করেছ?'

'করবার অবকাশ হল না; মনে মনে প্রার্থনা করি— ঈশ্বর যেন তাকে দয়া করেন।'

'যে কবিতাটি আজ তুমি পড়লে, বেশ বুঝতে পারছি এটা সেই হৃতভাগারই মনের কথা।'

'হ্যাঁ, তারই কথা বৈকি।'

'তবে তোমার কেন আজ ওটা মনে পড়ল?'

'কেমন করে বলব? ঐ কবিতাটির সঙ্গে আর—এক টুকরো কবিতা ছিল, সেটাও আজ আমার কেন মনে পড়ছে ঠিক বলতে পারি নে—

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তায় উচ্ছল হয়ে উঠে,
মুহুঃ প্রাণের আবেশবন্ধ টুটে,

এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদশতদল।'

অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরে বললে, 'বন্যা, সে ছেলেটা আজ আমাদের মাঝখানে কেন এসে পড়ল? ঈর্ষা করতে আমি ঘৃণা করি, এ আমার ঈর্ষা নয়, কিন্তু কেমন একটা ভয় আসছে মনে। বলা, তার দেওয়া ঐ কবিতাগুলো আজই কেন তোমার এমন করে মনে পড়ে গেল?'

'একদিন সে যখন আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তার পরে যেখানে বসে সে লিখত সেই ডেস্কে এই কবিতাদুটি পেয়েছি। এর সঙ্গে রবি ঠাকুরের আরো অনেক অপ্রকাশিত কবিতা, প্রায় এক খাতা ভরা। আজ তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, হয়তো সেইজন্যেই বিদায়ের কবিতা মনে এল।'

'সে বিদায় আর এ বিদায় কি একই?'

'কেমন করে বলব? কিন্তু, এ তর্কের তো কোনো দরকার নেই। যে কবিতা আমার ভালো লেগেছে তাই তোমাকে শুনিয়েছি, হয়তো এ ছাড়া আর কোনো কারণ এর মধ্যে নেই।'

'বন্যা, রবি ঠাকুরের লেখা যতক্ষণ না লোকে একেবারে ভুলে যাবে ততক্ষণ গুর ভালো লেখা সত্য করে ফুটে উঠবে না। সেইজন্যে গুর কবিতা আমি ব্যবহারই করি নে। দলের লোকের ভালো-লাগাটা কুয়াশার মতো, যা আকাশের উপর ভিজে হাত লাগিয়ে লাগিয়ে তার আলোটাকে ময়লা করে ফেলে।'

'দেখো মিতা, মেয়েদের ভালো-লাগা তার আদরের জিনিসকে আপন অন্দর-মহলে একলা নিজেই করে রাখে, ভিড়ের লোকের কোনো স্ববরই রাখে না। সে যত দাম দিতে পারে সব দিয়ে ফেলে, অন্য পাচজনের সঙ্গে মিলিয়ে বাজার যাচাই করতে তার মন নেই।'

'তা হলে আমারও আশা আছে বন্যা। আমার বাজার-দরের ছোট্ট একটা ছাপ লুকিয়ে ফেলে তোমার আপন দরের মস্ত একটা মার্কা নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াব।'

'আমাদের বাড়ি কাছে এসে পড়ল মিতা। এবার তোমার মুখে তোমার পথশেষের কবিতাটা শুনে নিই।'

'রাগ করো না বন্যা, আমি কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতা আওড়াতে পারব না।'

'রাগ করব কেন?'

'আমি একটি লেখককে আশিষ্কার করেছি, তার স্টাইল—'

'তার কথা তোমার কাছে বরাবরই শুনতে পাই। কোলকাতায় লিখে দিয়েছি তার বই পাঠিয়ে দেবার জন্যে।'

'সর্বনাশ! তার বই! সে লোকটার অন্য অনেক দোষ আছে, কিন্তু কখনো বই ছাপাতে দেয় না। তার পরিচয় আমার কাছ থেকেই তোমাকে ক্রমে ক্রমে পেতে হবে। নইলে হয়তো—'

'ভয় করো না মিতা, তুমি তাকে যে ভাবে বোঝা আমিও তাকে সেই ভাবেই বুঝে নেব এমন ভরসা আমার আছে। আমারই জিত থাকবে।'

'কেন?'

'আমার ভালো-লাগায় যা পাই সেও আমার, আর তোমার ভালো-লাগায় যা পাব সেও আমার হবে। আমার নেবার অঞ্জলি হবে দুজনের মনকে মিলিয়ে। কোলকাতায় তোমার ছোটো ঘরের বইয়ের আলমারিতে এক শেলফেই দুই কবির কবিতা ধরাতে পারব। এখন তোমার কবিতাটি বলা।'

'আর বলতে ইচ্ছে করছে না। মাঝখানে বড়ডো কতকগুলো তর্কবিতর্ক হয়ে হাওয়াটা ঝাঝা হয়ে গেল।'

'কিছু খারাপ হয় নি, হাওয়া ঠিক আছে।'

অমিত তার কপালের চুলগুলো কপালের থেকে উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে খুব দরদের সুর লাগিয়ে পড়ে গেল—

'সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরাস্তে,
শবরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়া দিক্‌ভ্রাস্তে।

বুঝেছ বন্যা? ঠান্ডা ডাক দিয়েছে শুকতারাকে, সে আপনার রাত পোহবার সঙ্গিনীকে চায়। নিজের রাতটার পরে গুর বিতুষা হয়ে গেছে।—

ধরা যেথা অশ্বরে মেশে
আমি আধে-জাগ্রত চন্দ্র,

আধারের বন্ধের পরে

আধেক আলোকরেখা-রক্ত।

ওর এই আধখানা জাগা, ঐ অল্প একটুখানি আলো, আধারটাকে সামান্য ঝানিকটা আঁচড়ে দিয়েছে। এই হল ওর খেদ। এই স্বল্পতার জ্বলে ওকে জড়িয়ে ফেলেছে, সেইটে ছিড়ে ফেলবার জন্যে ও যেন সমস্ত রাত্রি ঘুমাতে ঘুমাতে গুমরে উঠছে। কী আইডিয়া! গ্যান্ড!

আমার আসন রাখে পেতে

নিদ্রাগহন মহাশূন্য।

তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে,

তন্দ্রা ঝং করি ক্ষুণ্ণ।

কিন্তু, এমন হালকা করে বাঁচার বোঝাটা যে বড়ডো বেশি; যে নদীর জল মরেছে তার মধুর স্রোতের ক্লাস্তিতে জঞ্জাল জমে, যে স্বল্প সে নিজেকে বইতে গিয়ে ক্লিষ্ট হয়। তাই ও বলছে—

মন্দচরণে চলি পারে,

যাত্রা হয়েছে মোর সঙ্গ।

সুর খেমে আসে বারে বারে,

ক্লাস্তিতে আমি অবশাস্ত।

কিন্তু, এই ক্লাস্তিতেই কি ওর শেষ? ওর টিলে তারের বীণাকে নতুন করে বাঁধবার আশা ও পেয়েছে, দিগন্তের ওপারে কার পায়ের শব্দ ও যেন শুনল।—

সুন্দরী ওগো শুকতারা,

রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ।

স্বপ্নে যে বাণী হল হারা

জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

উদ্ধারের আশা আছে, কানে আসছে জাগ্রত বিশ্বের বিপুল কলরব, সেই মহাপথের দৃতী তার প্রদীপ হাতে করে এল বলে।—

নিশীথের তল হতে তুলি

লহো তারে প্রভাতের জন্য।

আধারে নিজেই ছিল ভুলি,

আলোকে তাহারে করো ধন্য।

যেখানে সুপ্তি হল লীনা,

যেথা বিশ্বের মহামন্ত্র,

অর্পিনু সেথা মোর বীণা

আমি আখে-জাগ্রত চন্দ্র।

এই হতভাগা চাঁদটা তো আমি। কাল সকালবেলা চলে যাব। কিন্তু, চলে যাওয়ায় তো শূন্য রাখতে চাই নে। তার উপরে আবির্ভাব হবে সুন্দরী শুকতারার, জাগরণের গান নিয়ে। অন্ধকার জীবনের স্বপ্নে এতদিন যা অস্পষ্ট ছিল, সুন্দরী শুকতারা তাকে প্রভাতের মধ্যে সম্পূর্ণ করে দেবে। এর মধ্যে একটা আশার জোঁর আছে, ভাবী প্রত্যুষের একটা উজ্জ্বল গৌরব আছে। তোমার ঐ রবি ঠাকুরের কবিতার মতো মিইয়ে-পড়া হাল-ছাড়া বিলাপ নয়।

‘রাগ করো কেন মিতা? রবি ঠাকুর যা পারে তার বেশি সে পারে না, এ কথা বার বার বলে লাভ কী?’

‘তোমরা সবাই মিলে তাকে নিয়ে বড়ো বেশি—’

‘ও কথা বোলো না মিতা। আমার ভালো-লাগা আমারই— তাতে যদি আর-কারো সঙ্গে আমার মিল হয়, বা তোমার সঙ্গে মিল না হয়, সেটাতে কি আমার দোষ? নাহয় কথা রইল, তোমার সে পঁচাত্তর টাকার বাসায় একদিন আমার যদি ছায়াগা হয় তা হলে তোমার কবির লেখা আমাকে শুনিয়ে, আমার কবির লেখা তোমাকে শোনাব না।’

‘কথাটা অনায়াস হল যে। পরস্পর পরস্পরের জুলুম ঘাড় পেতে বহন করবে, এইজন্যেই তো বিবাহ।’

‘রুটির জুলুম তোমার কিছুতেই সইবে না। রুটির ভোজে তোমরা নিমন্ত্রিত ছাড়া কাউকে ঘরে ঢুকতে দাও না, আমি অতিথিকেও আদর করে বসাই।’

'ভালো করলুম না তর্ক তুলে। আমাদের এখানকার এই শেষ সঙ্কেবেলার সুর বিগড়ে গেল।'

'একটুও না। যা-কিছু বলবার আছে সব স্পষ্ট করে বলেও যে সুরটা ঝাঁটি থাকে সেই আমাদের সুর। তার মধ্যে ক্ষমার অস্ত্র নেই।'

'আজ আমার মুখের বিস্বাদ ঘোচাতেই হবে। কিন্তু বাংলা কাব্যে হবে না। ইংরেজি কাব্যে আমার বিচারবুদ্ধি অনেকটা ঠাণ্ডা থাকে। প্রথম দেশে ফিরে এসে আমিও কিছুদিন প্রোফেসরি করেছিলুম।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'আমাদের বিচারবুদ্ধি ইংরেজ-বাড়ির বুলডগের মতো— ধুতির কঁচাটা দুলছে দেখলেই ষেউ ষেউ করে ওঠে। ধুতির মহলে কোনটা ভদ্র ও তার হিসেব পায় না। বরফ খানসামার তকমা দেখলে লেজ নাড়ে।'

'তা মানতেই হবে। পক্ষপাত জিনিসটা স্বাভাবিক জিনিস নয়। অধিকাংশ স্থলেই ওটা ফরমাশে তৈরি। ইংরেজি সাহিত্যে পক্ষপাত কানমলা খেয়ে খেয়ে ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে। এই অভ্যাসের জোরেই এক পক্ষকে মন্দ বলতে যেমন সাহস হয় না অন্য পক্ষকে ভালো বলতেও তেমন সাহসের অভাব ঘটে। থাক্ গে, আজ নিবারণ চক্রবর্তীও না, আজ একেবারে নিছক ইংরেজি কবিতা— বিনা তর্জমায়।'

'না না মিতা, তোমার ইংরেজি থাক, সেটা বাড়ি গিয়ে টেবিলে বসে হবে। আজ আমাদের এই সঙ্কেবেলাকার শেষ কবিতাটি নিবারণ চক্রবর্তীর হওয়াই চাই। আর-কারো নয়।'

অমিত উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'জয় নিবারণ চক্রবর্তীর। এতদিনে সে হল অমর। বন্যা, তাকে আমি তোমার সভাকবি করে দেব। তুমি ছাড়া আর-কারো দ্বারে সে প্রসাদ নেবে না।'

'তাতে কি সে বরাবর সজ্জট থাকবে?'

'না থাকে তো তাকে কান মলে বিদায় করে দেব।'

'আচ্ছা, কান মলার কথা পরে স্থির করব, এখন শুনিয়ো দাও।'

অমিত আবৃত্তি করতে লাগল—

'কত ধৈর্য ধরি

ছিলে কাছে দিবসশবরী !

তব পদ-অঙ্কনগুলিরে

কতবার দিয়ে গেছ মোর ভাগ্য-পথের ধূলিরে !

আজ যবে

দূরে যেতে হবে

তোমারে করিয়া যাব দান

তব জয়গান।

কতবার ব্যর্থ আয়োজনে

এ জীবনে

হোমাগ্নি উঠে নি জ্বলি,

শূন্যে গেছে চলি

হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী !

কতবার ক্ষণিকের শিখা

আকিয়াছে ক্ষীণ টিকা

নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।

লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।

এবার তোমার আগমন

হোমহতাশন

ছেলেছে গৌরবে।

যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।

আমার আহুতি দিনশেষে

করিয়াম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।

নহো এ প্রণাম

জীবনের পূর্ণ পরিণাম।

এ প্রগতি-পথে

স্পর্শ রাখো স্নেহভরে।

তোমার ঐশ্বর্য-মাঝে

সিংহাসন যেথায় বিরাজে

করিয়ো আহ্বান,

সেথা এ প্রগতি মোর পায় যেন স্থান।'

১৩

আশঙ্কা

সকালবেলায় কাজে মন দেওয়া আজ লাভণ্যর পক্ষে কঠিন। সে বেড়াতেও যায় নি। অমিত বলেছিল, শিলঙ থেকে যাবার আগে আজ সকালবেলায় সে এদের সঙ্গে দেখা করতে চায় না। সেই পণটাকে রক্ষা করবার ভার দুজননেরই উপর। কেননা, যে রাস্তায় ও বেড়াতে যায় সেই রাস্তা দিয়েই অমিতকে যেতে হবে। মনে তাই লোভ ছিল যথেষ্ট। সেটাকে কষে দমন করতে হল। যোগমায়া খুব সকালেই স্নান সেরে তাঁর আঙ্কিকের জ্ঞান্য কিছু ফুল তোলেন। তিনি বেরোবার আগেই লাভণ্য সে জায়গাটা থেকে চলে এল যুক্যালিপটাঙ্গ-তলায়। হাতে দুই-একটা বই ছিল, বোধ হয় নিজেই এবং অন্যদেরকে জোলাবার জন্যে। তার পাতা খোলা, কিন্তু বেলা যায়, পাতা গুলটানো হয় না। মনের মধ্যে কেবলই বলছে— জীবনের মহোৎসবের দিন কাল শেষ হয়ে গেল। আজ সকালে এক-একবার মেঘরৌদ্রের মধ্যে দিয়ে ভাস্কনের দূত আকাশ ধোঁটীয়ে বেড়াচ্ছে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে অমিত চিরপলাতক, একবার সে সেরে গেলে আর তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। রাস্তায় চলতে চলতে কখন সে গল্প শুরু করে, তার পর রাত্রি আসে, পরদিন সকালে দেখা যায় গল্পের গাঁথন ছিল— পথিক গেছে চলে। লাভণ্য তাই ভাবছিল, ওর গল্পটা এখন থেকে চিরদিনের মতো রইল বাকি। আজ সেই অসমাপ্তির ম্লানতা সকালের আলোয়; অকাল-অবসানের অবসাদ আর্দ্র হাওয়ার মধ্যে।

এমন সময়, বেলা তখন নটা, অমিত দুমদাম্-শব্দে ঘরে ঢুকেই 'মাসিমা মাসিমা' করে ডাক দিলে। যোগমায়া প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে তাঁড়রের কাজে প্রবৃত্ত। আজ তাঁরও মনটা পীড়িত। অমিত তার কথায় হাসিতে চাঞ্চলে এতদিন তাঁর স্নেহাসক্ত মনকে, তাঁর ঘরকে ভরে রেখেছিল। সে চলে গেছে এই ব্যথার বোঝা নিয়ে তাঁর সকালবেলাটা যেন বাঁটবিন্দুর ভারে সদ্যঃপাতী ফুলের মতো নুয়ে পড়ছে। তাঁর বিচ্ছেদকাতর ঘরকন্নার কাজে আজ তিনি লাভণ্যকে ডাকেন নি; বুঝেছিলেন আজ তার দরকার ছিল একলা থাকার, লোকের চোখের আড়ালে।

লাভণ্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, কোলের থেকে বই গেল পড়ে, জানতেও পারলে না। এ দিকে যোগমায়া তাঁড়র-ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী বাবা অমিত, ভূমিকম্প নাকি?'

'ভূমিকম্পই তো। জিনিসপত্র রওনা করে দিয়েছি; গাড়ি ঠিক; ডাকঘরে গেলুম দেখতে চিঠিপত্র কিছু আছে কি না। সেখানে এক টেলিগ্রাম।'

অমিতর মুখের ভাব দেখে যোগমায়া উদ্‌বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খবর সব ভালো তো?'

লাভণ্যও ঘরে এসে ছুটল। অমিত ব্যাকুল মুখে বললে, 'আজই সঙ্কেবেলায় আসছে সিসি, আমার বোন, তার বন্ধু কেঁটি মিস্তির, আর তার দাদা নরেন।'

'তা, ভাবনা কিসের বাহা? শুনেছি, ষোড়দৌড়ের মাঠের কাছে একটা বাড়ি খালি আছে। যদি নিতান্ত না পাওয়া যায় আমার এখানে কি একরকম করে জায়গা হবে না?'

'সেজন্যে ভাবনা নেই মাসি। তারা নিজেরাই টেলিগ্রাফ করে হোটলে জায়গা ঠিক করেছে।'

'আর যাই হোক বাবা, তোমার বোনো এসে যে দেখবে তুমি ঐ লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে আছ সে কিছুতেই হবে না। তারা আপন লোকের খ্যাপামির জন্যে দায়িক করবে আমাদেরকেই।'

'না মাসি, আমার প্যারাডাইস লন্ট। ঐ নগ্ন আসবাবের স্বর্গ থেকে আমার বিদায়। সেই দড়ির খাটিয়ার নীড় থেকে আমার সুখবপুগুণ্ডো উড়ে পালাবে। আমাকেও জায়গা নিতে হবে সেই অতিপরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অতিসভ্য কামরায়।'

কথাটা বিশেষ কিছু নয়, তবু লাভগ্যর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এতদিন একটা কথা ওর মনেও আসে নি যে, অমিতর যে সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে। এক মুহূর্তেই সেটা বুঝতে পারলে। অমিত যে আজ কোলকাতায় চলে যাচ্ছিল তার মধ্যে বিচ্ছেদের কঠোর মূর্তি ছিল না। কিন্তু এই-যে আজ ও হোটেল যেতে বাধ্য হল এইটেতেই লাভগ্য বুঝলে, যে বাসা এতদিন ওরা দুজনে নানা অদৃশ্য উপকরণে গড়ে তুলছিল সেটা কোনোদিন বৃষ্টি আর দৃশ্য হবে না।

লাভগ্যর দিকে একটু চেয়ে অমিত যোগমায়াকে বললে, 'আমি হোটেলেরই যাই আর জাহান্নামেরই যাই, কিন্তু এইখানেই আমার আসল বাসা।'

অমিত বুঝেছে, শহর থেকে আসছে একটা অশুভ দৃষ্টি। মনে মনে নানা প্ল্যান করছে যাতে সিসির দল এখানে না আসতে পারে। কিন্তু, ইদানীং ওর চিঠিপত্র আসছিল যোগমায়ার বাড়ির ঠিকানায়। তখন ভাবে নি, কোনো সময়ে তাতে বিপদ ঘটতে পারে। অমিতর মনের ভাবগুলো চাপা থাকতে চায় না, এমন-কি, প্রকাশ পায় কিছু আতিশয্যের সঙ্গে। ওর বোনের আসা সম্বন্ধে অমিতর এত বেশি উদবেগ যোগমায়ার কাছে অসংগত ঠেকছিল; লাভগ্যও ভাবলে অমিত ওকে নিয়ে বোনের কাছে লজ্জিত। ব্যাপারটা লাভগ্যর কাছে বিশ্বাস ও অসম্মানজনক হয়ে দাঁড়াল।

অমিত লাভগ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার কি সময় আছে? বেড়াতে যাবে?'

লাভগ্য একটু যেন কঠিন করে বললে, 'না, সময় নেই।'

যোগমায়া ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'যাও-না মা, বেড়িয়ে এসো গে।'

লাভগ্য বললে, 'কর্তামা, কিছুকাল থেকে সুরমাকে পড়ানোর বড়ো অবহেলা হয়েছে। খুবই অন্যায্য করেছে। কাল রাতেই ঠিক করেছিলুম আজ থেকে কিছুতেই আর টিলেমি করা হবে না।' বলে লাভগ্য ঠোট চেপে মুখ শব্দ করে রইল।

লাভগ্যর এই জেদের মেজাজটা যোগমায়ার পরিচিত। পীড়াপীড়ি করতে সাহস করলেন না।

অমিতও নীরস কণ্ঠে বললে, 'আমিও চলনুম কর্তব্য করতে, ওদের জন্যে সব ঠিক করে রাখা চাই।'

এই বলে চলে যাবার আগে বারন্দায় একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। বললে, 'বন্যা, ঐ চেয়ে দেখো। গাছের আড়াল থেকে আমার বাড়ির চালটা অল্প একটু দেখা যাচ্ছে। একটা কথা তোমাদের বলা হয় নি, ঐ বাড়িটা কিনে নিয়েছি। বাড়ির মালেক অর্থাৎ, নিশ্চয় ভেবেছে ওখানে সোনার গোপন বনি আবিষ্কার করে থাকবে। দাম বেশ একটু চড়িয়ে নিয়েছে। ওখানে সোনার বনির সন্ধান তো পেয়েইছিলুম, সে সন্ধান একমাত্র আমিই জানি। আমার জীর্ণ কুটিরের ঐশ্বর্য সবার চোখ থেকে লুকোনো থাকবে।'

লাভগ্যর মুখে গভীর একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। বললে, 'আর-কারো কথা অত করে তুমি ভাব কেন? নাহয় আর-সবাই জানতে পারলে। ঠিকমত জানতে পারাই তো চাই, তা হলে কেউ অমর্যাদা করতে সাহস করে না।'

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অমিত বললে, 'বন্যা, ঠিক করে রেখেছি বিয়ের পরে ঐ বাড়িতেই আমরা কিছুদিন এসে থাকব। আমার সেই গঙ্গার ধারের বাগান, সেই ঘাট, সেই বটগাছ সব মিলিয়ে গেছে ঐ বাড়িটার মধ্যে। তোমার দেওয়া মিতালি নাম ওকেই সাছে।'

'ও বাড়ি থেকে আজ তুমি বেরিয়ে এসেছ মিতা। আবার একদিন যদি ঢুকতে চাও, দেখবে ওখানে তোমাকে কুলোবে না। পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না। সেদিন তুমি বলেছিলে, জীবনে মানুষের প্রথম সাধনা দারিদ্র্যের, দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্যের। তার পরে শেষ সাধনার কথা বল নি, সেটা হচ্ছে, ত্যাগের।'

'বন্যা, ওটা তোমাদের রবি ঠাকুরের কথা; সে লিখেছে, শাজাহান আজ তার তাজমহলকেও ছাড়িয়ে গেল। একটা কথা তোমার কবির মাথায় আসে নি যে, আমরা তৈরি করি তৈরি জিনিসকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যেই। বিশ্বসৃষ্টিতে ঐটেকেই বলে এভোল্যুশন। একটা অনাসৃষ্টি-ভূত যাড়ে চেপে থাকে, বলে 'সৃষ্টি করো; সৃষ্টি করলেই ভূত নামে, তখন সৃষ্টিটাকেও আর দরকার থাকে না। কিন্তু তাই বলে ঐ ছেড়ে-যাওয়াটাই চরম কথা নয়। জগতে শাজাহান-মমতাজের অক্ষয় ধারা বয়ে চলেছেই— ওরা কি একজন মাত্র? সেই জন্যেই তো তাজমহল কোনোদিন শূন্য হতেই পারল না। নিবারণ চক্রবর্তী বাসরঘরের উপর একটা কবিতা লিখেছে। সেটা তোমাদের কবিবরের তাজমহলের সংক্ষিপ্ত উত্তর, পোস্টকার্ডে লেখা—

তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে

রাত্রি যবে

উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্ররবে।

হায় রে বাসরঘর,

বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ঙ্কর।

তবু সে যতই ভাস্তেচোরে,

মালাবদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন করে,

তুমি আছ ক্ষয়হীন

অনুদিন;

তোমার উৎসব

বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।

কে বলে, তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল

শূন্য করি তব শয্যাতল?

যায় নাই, যায় নাই—

নব নব যাত্রী-মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই

তোমার আস্থানে

উদার তোমার দ্বার-পানে।

হে বাসরঘর,

বিশ্বে শ্রেম মতুহীন, তুমিও অমর।

রবি ঠাকুর কেবল চলে যাবার কথাই বলে, রায়ে যাবার গান গাইতে জানে না। বন্যা, কবি কি বলে যে আমারও দুজন যেদিন ঐ দরজায় যা দেব দরজা খুলবে না?’

‘মিনতি রাখো, মিতা, আজ সকালে কবির লড়াই তুলো না। তুমি কি ভাবছ প্রথম দিন থেকেই আমি জানতে পারি নি যে তুমিই নিবারণ চক্রবর্তী? কিন্তু, তোমার ঐ কবিতার মধ্যে এখনই আমাদের ভালোবাসার সমাধি তৈরি করতে শুরু করো না, অন্তত তার মরার জন্যে অপেক্ষা করো।’

অমিত আজ নানা বাস্তব কথা বলে ভিতরের কোন্-একটা উদ্বেগকে চাপা দিতে চায়, লাভণ্য তা বুঝেছিল।

অমিতও বুঝতে পেরেছে, কাব্যের দ্বন্দ্ব কাল সন্ধ্যাবেলায় বেখাপ হয় নি, আজ সকালবেলায় তার সুর কেটে যাচ্ছে। কিন্তু, সেইটে যে লাভণ্যর কাছে সুস্পষ্ট সেও গুর ভালো লাগল না। একটু নীরসভাবে বললে, ‘তা হলে যাই, বিশ্বজগতে আমারও কাজ আছে, আপাতত সে হচ্ছে হোটেল-পরিদর্শন। ও দিকে লক্ষ্মীছাড়া নিবারণ চক্রবর্তীর ছুটির মেয়াদ এবার ফুরোল বৃষ্টি।’

তখন লাভণ্য অমিতের হাত ধরে বললে, ‘দেখো মিতা, আমাকে চিরদিন যেন ক্ষমা করতে পারে। যদি একদিন চলে যাবার সময় আসে তবে, তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ করে চলে যেয়ো না।’

এই বলে চোখের জল ঢাকবার জন্যে দ্রুত অন্য ঘরে গেল। অমিত কিছুক্ষণ স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে আস্তে আস্তে যেন অন্যমনে গেল যুক্যালিপটাস-তলায়। দেখলে, সেখানে আশুরোটের গোটাকতক ভাস্কি খোলা ছড়ানো। দেখেই ওর মনটার ভিতর কেমন একটা ব্যাথা চেপে ধরলে। জীবনের ধারা চলতে চলতে তার যে-সব চিহ্ন বিছিয়ে যায় সেগুলোর তুচ্ছতাই সব চেয়ে সক্রমণ। তার পরে দেখলে ঘাসের উপরে একটা বই, সেটা রবি ঠাকুরের ‘বলাকা’। তার নীচের পাতটা ভিক্ষে গেছে। একবার ভাবলে, ফিরিয়ে দিয়ে আসি গে; কিন্তু ফিরিয়ে দিলে না, সেটা নিল পকেটে। হোটেল যাব-যাব করলে, তাও গেল না; বসে পড়ল গাছতলাটাতে। রাতের ভিক্ষে মেঘে আকাশটাকে খুব করে মেজ্জে দিয়েছে। ধুলো-ধোওয়া বাতাসে অত্যন্ত স্পষ্ট করে প্রকাশ পাচ্ছে চার দিকের ছবিটা; পাহাড়ের আর গাছপালার সীমান্তগুলি যেন ঘন নীল আকাশে খুদে দেওয়া, জগৎটা যেন কাছে এগিয়ে একেবারে মনের উপরে এসে ঠেকল। আস্তে আস্তে বেলা চলে যাচ্ছে, তার ভিতরটাতে ভৈরবীর সুর।

এখনই খুব কবে কাজে লাগবে বলে লাভণ্যর পণ ছিল, তবু যখন দূর থেকে দেখলে অমিত গাছতলায় বসে, আর থাকতে পারলে না, বৃক্কের ভিতরটা হাঁপিয়ে উঠল, চোখ এল জ্বলে ছলছলিয়ে।

কাছে এসে বললে, ‘মিতা, তুমি কী ভাবছ?’

‘এতদিন যা ভাবছিলুম একেবারে তার উল্টো।’

'মাঝে মাঝে মনটাকে উলটিয়ে না দেখলে তুমি ভালো থাক না। তোমার উলটো ভাবনাটা কিরকম শুনি।'

'তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে এতদিন কেবল ঘর বানাচ্ছিলুম— কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো পাহাড়ের উপরে। আজ মনের মধ্যে জাগছে সকালবেলাকার আলোয় উদাস—করা একটা পথের ছবি— অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় ঐ পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে। হাতে আছে লোহার—ফলা—ওয়াল লম্বা লাঠি, পিঠে আছে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা তোঁকা খলি। তুমি চলবে সঙ্গে। তোমার নাম সার্থক হোক বন্যা, তুমি আমাকে বন্ধ ঘর থেকে বের করে পথে ভাসিয়ে নিয়ে চললে বৃষ্টি। ঘরের মধ্যে নানান লোক, পথ কেবল দুজনের।'

'ডায়মন্ডহারবারের বাগানটা তো গেছেই, তার পরে সেই পঁচাত্তর টাকার ঘর—বেচারিও গেল। তা, যাক গে। কিন্তু চলবার পথে বিচ্ছেদের ব্যবস্থাটা কিরকম করবে? দিনান্তে তুমি এক পাশুশালায় ঢুকবে আর আমি আর—একটাতে?'

'তার দরকার হয় না বন্যা। চলাতেই নতুন রাখে, পায়ে পায়ে নতুন, পুরোনো হবার সময় পাওয়া যায় না। বসে থাকটাই বুজোমি।'

'হঠাৎ এ খেয়ালটা তোমার কেন মনে হল মিতা?'

'তবে বলি। হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেনি বোধ হয়, রায়চাঁদ—প্রমচাঁদ—ওয়াল? ভারত-ইতিহাসের সাবেক পথগুলো সন্ধান করবে বলে কিছুকাল থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার করতে চায়; আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।'

লাবণ্যর বৃকের ভিতরে হঠাৎ খুব একটা ধাক্কা দিলে। কথাটাকে বাধা দিয়ে অমিতকে বললে, 'শোভনলালের সঙ্গে একই বৎসর আমি এম.এ. দিয়েছি। তার সব স্বরটা শুনতে ইচ্ছে করে।'

'এক সময়ে সে খেপেছিল, আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল সেইটেকে আয়ত্ত করবে। ঐ রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েনসাঙের তীর্থযাত্রা, ঐ রাস্তা দিয়েই তারও পূর্বে আলেকজান্ডারের রণযাত্রা। খুব কষে পুশতু পড়লে, পাঠানি কায়দাকানুন অভ্যেস করলে। সুন্দর চেহারা, টিলে কাপড়ে ঠিক পাঠানের মতো দেখতে হয় না, দেখায় যেন পারসিকের মতো। আমাকে এসে ধরলে, সেখানে ফরাসি পণ্ডিতরা এই কাজে লেগেছেন, তাঁদের কাছে পরিচয়পত্র দিতে— ফ্রান্সে থাকতে তাঁদের কারো কারো কাছে আমি পড়েছি। দিলেম পত্র, কিন্তু ভারত-সরকারের ছাড়চিঠি জুটল না। তার পর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে— কখনো কাশ্মীরে, কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছে হয়েছে হিমালয়ের পূর্ব-প্রান্তটাতেও সন্ধান করবে। বৌদ্ধধর্মপ্রচারের রাস্তা এ দিক দিয়ে কোথায় কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চায়। ঐ পথ-খেপাটার কথা মনে করে আমরা মন উদাস হয়ে যায়। পৃথিবীর মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোব খোওয়াই, ঐ পাগল বেরিয়েছে পথের পৃথিবী পড়তে, মানববিধাতার নিজের হাতে লেখা।— আমার কী মনে হয় জান?'

'কী, বলো।'

'প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন কাঁকন-পরা হাতের ধাক্কা ঝেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েছে। ওর সমস্ত কাহিনীটা স্পষ্ট জ্ঞান নে, কিন্তু একদিন ওতে—আমাতে একলা ছিলুম, নানা কথায় হল প্রায় রাত-দুপুর, জানালার বাইরে হঠাৎ চাঁদ দেখা দিল একটা ফুলন্ত জারুল গাছের আড়ালে— ঠিক সেই সময়টাতে কোনো—একজনের কথা বলতে গেল, নাম করলে না, বিবরণ কিছুই বললে না, অল্প একটু আভাস দিতেই গলা ভার হয়ে এল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল। বৃষ্টিতে পারলুম ওর জীবনের মধ্যে কোনখানে অত্যন্ত একটা নিষ্ঠুর কথা বিধে আছে। সেই কথাটাকেই বৃষ্টি পথ চলতে চলতে ও পায়ে পায়ে ঝইয়ে দিতে চায়।'

লাবণ্যর হঠাৎ উদ্ভিদতত্ত্বের ঝোক এল, নুয়ে পড়ে দেবতে লাগল ঘাসের মধ্যে সাদাশ-হলদেয়-মেলানো একটা বুনে ফুল। একান্ত মনোযোগে তার পাপড়িগুলো গুনে দেখার জরুরি দরকার পড়ল।

অমিত বললে, 'জান, বন্যা, আমাকে তুমি আজ পথের দিকে ঠেলে দিয়েছ।'

'কেমন করে?'

'আমি ঘর বানিয়েছিলুম। আজ সকালে তোমার কথায় মনে হল তুমি তার মধ্যে পা দিতে কুণ্ঠিত। আজ দু মাস ধরে মনে মনে ঘর সাজালুম। তোমাকে ডেকে বললুম, এসো বধু, ঘরে এসো। তুমি আজ বধুসজ্জা বসিয়ে ফেললে; বললে এবানে জায়গা হবে না বন্ধু, চিরদিন ধরে আমাদের সপ্তপদী-গমন হবে।'

বনফুলের বটানি আর চলল না। লাবণ্য হঠাৎ উঠে পড়ে ক্লিষ্ট স্বরে বললে, 'মিতা, আর নয়, সময় নেই।'

ধূমকেতু

এতদিন পরে অমিত একটা কথা আবিষ্কার করেছে যে, লাভণ্যর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা শিলঙসুদ্ধ বাঙালি জানে। গভর্নেন্ট আফিসের কেরানিদের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাদের জীবিকা-ভাগ্যগগনে 'কোন গ্রহ রাজা হৈল কেবা মন্ত্রিবর'। এমন সময় তাদের চোখে পড়ল মানবজীবনের জ্যোতির্মণ্ডলে এক যুগ্মতারার আবর্তন, একেবারে ফাস্ট ম্যাগ্নিচুডের আলো। পর্যবেক্ষকদের প্রকৃতি-অনুসারে এই দুটি নবদীপ্যমান জ্যোতিষ্কের আগ্নেয় নাটোর নানাপ্রকার ব্যাখ্যা চলছে।

পাহাড়ে হাওয়া ষেতে এসে এই ব্যাখ্যার মধ্যে পড়েছিল কুমার মুখুঙ্কে— অ্যাটার্নি। সংক্ষেপে কেউ তাকে বলে কুমার মুখো, কেউ বলে মার মুখো। সিসিদের মিত্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয় সে, কিন্তু জ্ঞাতি, অর্থাৎ জানানোনার দলে। অমিত তাকে ধূমকেতু মুখো নাম দিয়েছিল। তার একটা কারণ, সে এদের দলের বাইরে, তবু সে মাঝে মাঝে এদের কক্ষপথে পুচ্ছ বুলিয়ে যায়। সকলেই আন্দাজ করে, যে গ্রহটি তাকে বিশেষ করে টান মারছে তার নাম লিসি। এই নিয়ে সকলেই কৌতুক অনুভব করে, কিন্তু, লিসি স্বয়ং এতে তুচ্ছ ও লজ্জিত। তাই লিসি প্রায়ই প্রবলবেগে এর পুচ্ছমর্দন করে চলে যায়, কিন্তু দেখতে পাই, তাতে ধূমকেতুর লেজার বা মুড়োর কোনোই লোকসান হয় না।

অমিত শিলঙের রাস্তায় ঘাটে মাঝে মাঝে কুমার মুখোকে দূর থেকে দেখেছে। তাকে না দেখতে পাওয়া শক্ত। বিলেতে আঙ্কো যায় নি বলে তার বিলিতি কায়দা খুব উৎকটভাবে প্রকাশমান। তার মুখে নিরবচ্ছিন্ন একটা দীর্ঘ মোটা চুরুট থাকে, এইটাই তার ধূমকেতু মুখো নামের প্রধান কারণ। অমিত তাকে দূর থেকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, এবং নিজেকে ভুলিয়েছে যে ধূমকেতু বুকি সেটা বুঝতে পারে নি। কিন্তু দেখেও দেখতে না পাওয়াটা একটা বড়ো-বিদ্যের অন্তর্গত। চুরিবিদ্যের মতোই, তার সার্থকতার প্রমাণ হয় যদি না পড়ে ধরা। তাতে প্রত্যক্ষ দৃশ্যটাকে সম্পূর্ণ পার করে দেখবার পারদর্শিতা চাই।

কুমার মুখো শিলঙের বাঙালি সমাজ থেকে এমন অনেক কথা সংগ্রহ করেছে যাকে মোটা অক্ষরে শিরোনামা দেওয়া যেতে পারে 'অমিত রায়ের অমিতাচার'। মুখে সব চেয়ে নিন্দে করেছে যারা, মনে সব চেয়ে রসভোগ করেছে তারা। যকৃতের বিকৃতিশোধনের জন্য কুমার কিছুদিন এখানে থাকবে বলেই স্থির ছিল, কিন্তু জনশ্রুতিবিশ্বাসের উগ্ৰ উৎসাহে তাকে পাঁচ দিনের মধ্যে কোলকাতায় ফেরালে। সেখানে গিয়ে অমিত সম্বন্ধে তার চুরুট-ধূমাকত অত্যুক্তি-উদগারে সিসি-লিসি-মহলে কৌতুকে কৌতুহলে জড়িত বিভীষিকা উৎপাদন করলে।

অভিচ্ছ পাঠকমাত্রই এতক্ষণে অনুমান করে থাকবেন যে, সিসি-দেবতার বাহন হচ্ছে কেটি মিস্তিরের দাদা নরেন। তার অনেক দিনের একনিষ্ঠ বাহন-দশা এবার বৈবাহনের দশম দশায় উত্তীর্ণ হবে, এমন কথা উঠেছে। সিসি মনে মনে রাজি। কিন্তু যেন রাজি নয় ভাব দেখিয়ে একটা প্রদোষাঙ্ককার ঘনিয়ে রেখেছে। অমিতর সম্মতিসহায়ে নরেন এই সংশয়টুকু পার হতে পারবে বলে ঠিক করেছিল কিন্তু অমিত হাম্বাগটা না ফেরে কোলকাতায়, না দেয় চিঠির জবাব। ইংরেজি যতগুলো গহিত শব্দভেদী বাক্য তার জানা ছিল সবগুলিই প্রকাশ্যে ও স্বগত উজ্জ্বিত নিরুদ্দেশ অমিতর প্রতি নিষ্ক্ষেপ করেছে। এমন-কি, তারযোগে অত্যন্ত বেতার বাক্য শিলঙে পাঠাতে ছাড়ে নি, কিন্তু উদাসীন নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে উদ্ধত হাউইয়ের মতো কোথাও তার দাহরেখা রইল না। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল, অবস্থাটার সরেজমিন তদন্ত হওয়া দরকার। সর্বনাশের স্রোতে অমিতর ঝাঁটির ডগাটাও যদি কোথাও একটু দেখা যায়, টেনে ডাঙায় তোলা আশু দরকার। এ সম্বন্ধে তার আপন বোন সিসির চেয়ে পরের বোন কেটির উৎসাহ অনেক বেশি। ভারতের ধন বিদেশে লুপ্ত হচ্ছে বলে আমাদের পলিটিকসের যে আক্ষেপ কেটি মিটারের ভাবখানা সেই জাতের।

নরেন মিটার দীর্ঘকাল যুরোপে ছিল। জমিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও; বিদ্যার্জনের ভাবনাও সেই পরিমাণেই লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ করেছিল— অর্থ এবং সময় দুই দিক থেকে। নিজেকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহেতুক আত্মসম্মান লাভ করা যায়। এইজন্যে আর্ট-সরস্বতীর অনুসরণে যুরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহরের বোহিমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে। কিছুদিন চেষ্টার পর স্পষ্টবন্দা হিতৈষীদের কঠোর অনুরোধে ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হল, এখন সে ছবির সমজ্ঞদারিতে পরিপক্ব বলেই নিজের প্রমাণনিরপেক্ষ পরিচয় দেয়। চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না, কিন্তু দুই হাতে নোটাকে চটকাতে পারে। ফরাসি ছাঁচে সে তার গ্যোফের দুই

প্রত্যন্দশেকে সযত্নে কটকিত করেছে, এদিকে মাথায় ঝাঁকড়া চুলের প্রতি তার সযত্ন অবহেলা। চেহারাখানা তার ভালোই, কিন্তু আরো ভালো করবার মহার্ঘ সাধনায় তার আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাসবৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত। তার মুখ-ধোবার টেবিলের উপকরণ দশাননের পক্ষেও বাহুল্য হত। দামি হাভানা দু-চার টান টেনেই অনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা এবং মাসে মাসে গাএবস্ত্র পার্শেল শোস্টে ফরাসি ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো, এ-সব দেখে ওর আভিজাত্য সন্দেহে দ্বিধাক্ষিত করতে সাহস হয় না। যুরোপের শ্রেষ্ঠ দর্জিখালার রেজিস্ট্রি বহিতে ওর গায়ের মাপ ও নম্বর লেখা এখন-সব কোঠায় যেখানে খুঁজলে পাতিয়ালা-কপূর্তলতার নাম পাওয়া যেতে পারে। ওর ম্যাজ-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজ্ঞিত, মিলশ্বিত, আমীলিত-চক্ষুর-অলস-কটাঙ্ক-সহযোগে অনতিব্যক্ত, যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায়, ইংলন্ডের অনেক নীলরক্তবান আমীরদের কঠম্বরে এইরকম গদগদ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়দোড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাণ্যসম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।

কেটি ঘিটারের আসল নাম কেতকী। চালচলন ওর দাদারই কায়দা-কারখানার বকযন্ত্রপরাষায় শোধিত কৃতীয় ক্রমের চোলাই-করা, বিলিতি কৌলীনের ঝাঁঝালো এসেন্স। সাধারণ বাঙালি মেয়ের দীর্ঘকেশসৌরভের গর্বে প্রতি গর্বসহকারেই কেটি দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে, খোঁপাটা ব্যাঙাচির লোজের মতো মিলুপ হয়ে অনুকরণের উল্লস্কণীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করেছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলোপের দ্বারা এনামেল-করা। জীবনের আদ্যলীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিল স্নিগ্ধ, এখন মনে হয় সে যেন যাকে-তাকে দেখতেই পায় না। যদি-বা দেখে তো লক্ষ্যই করে না, যদি-বা লক্ষ্য করে তাতে যেন আধ-খোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। প্রথম বয়সে ঠোঁটদুটিতে সরল মাধুর্য ছিল, এখন বার বার বেঁকে বেঁকে তার মধ্যে ঝাঁক অঙ্কুরের মতো ভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। মেয়েদের বেশের বর্ণনায় আমি আনন্ডি, তার পরিভাষা জানি নে। মোটের উপর চোখে পড়ে, উপরে একটা পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুব্বুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত; আর অনাবৃত বাহুদুটিকে কখনো কখনো টেবিলে, কখনো চৌকির হাতায়, কখনো পরস্পরকে জড়িত করে যত্নের ভঙ্গিতে আলগোছে রাখবার সাধনা সুস্পর্শ। আর, যখন সুমার্জিতনবরমণীয় দুই আঙুলে চেপে সিগারেট খায় সেটা যতটা অলংকরণের অঙ্গ-রূপে ততটা ধূমপানের উদ্দেশ্যে নয়। সব চেয়ে ঘটা মনে দৃষ্টিভ্রান্ত উদ্বেগ করে সেটা ওর সমুচ্চ-খুরওয়াল জুতোজোড়ার কুলি ভঙ্গিমায়; যেন ছাগলজাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছিলেন, যেন মুচির দস্ত পদোন্নতির কিছুত বক্রতায় ধরনীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা এভোলুশনের ক্রটি সংশোধন করা হয়।

সিসি এখনো আছে মাঝমাঝি জায়গায়। শেষের ডিগ্রি এখনো পায় নি, কিন্তু ডবল প্রোমোশন পেয়ে চলেছে। উচ্চ হাসিতে, অজস্র খুশিতে, অনর্গল আলাপে ওর মধ্যে সর্বদা একটা চলন-বলন টগবগ করছে— উপাসকমণ্ডলীর কাছে সেটার খুব আদর। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায় কোথাও তার ভাবখানা পাকা, কোথাও কাঁচা; এরও তাই। খুরওয়াল জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ, কিন্তু অনবচ্ছিন্ন খোঁপাটাকে রয়ে গেছে অতীত যুগ; পায়ের দিকে শাড়ির বহর ইঞ্চি দুই-তিন খাটো, কিন্তু উত্তরচ্ছদে অসম্ভবতির সীমানা এখনো আলঙ্কতার অভিমুখে; অকারণ দস্তানা পরা অভ্যস্ত, অথচ এখনো এক হাতের পরিবর্তে দুই হাতেই বাল্য; সিগারেট টানতে আর মাথা ঘোরে না, কিন্তু পান খাবার আসক্তি এখনো প্রবল। বিস্কুটের টিনে ঢেকে আচার-আমসম্ব পাঠিয়ে দিলে সে আপত্তি করে না; ক্রিস্টমাসের প্লাম পুডিং এবং পৌষপার্বণের পিঠে এই দুইয়ের মধ্যে শেষটার প্রতিই তার লোলুপতা কিছু বেশি। ফিরিসি নাচওয়ালীর কাছে সে নাচ শিখেছে, কিন্তু নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে ঘূর্ণিচ নাচতে সামান্য একটু সংকোচ বোধ করে।

অমিত সম্বন্ধে জনরব শুনে এরা বিশেষ উদ্ভিগ্ন হয়ে চলে এসেছে। বিশেষত, এদের পরিভাষাগত শ্রেণীবিভাগে লাভগ্য গভর্নেন্স। ওদের শ্রেণীর পুরুষের জাত মারবার জন্যেই তার 'স্পেশাল ক্রিয়েশন'। মনে সন্দেহ নেই, টাকার লোভে মানের লোভেই সে অমিতকে কয়ে আঁকড়ে ধরেছে, ছাড়াতে গেলে সেই কান্ডটাতে মেয়েদেরই সম্মার্জনপটু হস্তক্ষেপ করতে হবে। চতুরমুখ তাঁর চার জোড়া চক্ষে মেয়েদের দিকে কটাঙ্কপাত ও পক্ষপাত একসঙ্গেই করে থাকবেন, সেইজন্যে মেয়েদের সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিতে পুরুষদের গড়েছেন নিরেট নির্বোধ করে। তাই, স্বজাতিমোহমুক্ত আত্মীয় মেয়েদের সাহায্য না পেলে অনাত্মীয় মেয়েদের মোহজাল থেকে পুরুষদের উদ্ধার পাওয়া এত দুঃসাধ্য।

আপাতত এই উদ্ধারের প্রণালীটা কিরকম হওয়া চাই তাই নিয়ে দুই নারী নিজেদের মধ্যে একটা পরামর্শ ঠিক করেছে। এটা নিশ্চিত, গোড়ায় অমিতকে কিছুই জানতে দেওয়া হবে না। তার আগেই শত্রুপক্ষকে আর রক্ষণত্রটাকে দেখে আসা চাই। তার পর দেখা যাবে মায়বিনীর কত শক্তি।

প্রথমে এসেই চোখে পড়ল অমিতর উপর ঘন এক পোঁচ গ্রাম্য রঙ। এর আগেও ওর দলের সঙ্গে অমিতর ভাবের মিল ছিল না। তবু সে তখন ছিল প্রবর নাগরিক— চাঁচা, মাজা, ঝকঝকে। এখন কেবল যে খোলা হাওয়ায় রঙটা কিছু ময়লা হয়েছে তা নয়, সবসুদ্ধ ওর উপর যেন গাছপালার আমেজ দিয়েছে। ও যেন কাঁচা হয়ে গেছে এবং ওদের মতো কিছু যেন বোকা। ব্যবহারটা প্রায় যেন সাধারণ মানুষের মতো। আগে স্বীকৃতির সমস্ত বিষয়কে হাসির অশ্রু নিয়ে তাড়া করে বেড়াত, এখন ওর সে শখ নেই বললেই হয়; এইটেকেই ওরা মনে করেছে নিদেন কালের লক্ষণ।

সিসি একদিন ওকে স্পষ্টই বললে, 'দূর থেকে আমরা মনে করেছিলুম তুমি বুঝি বাসিয়া হবার দিকে নামছ। এখন দেখছি তুমি হয়ে উঠছ যাকে বলে গ্রীন, এখনকার পাইনগাছের মতো, হয়তো আগেকার চেয়ে স্বাস্থ্যকর, কিন্তু আগেকার মতো ইন্টারেস্টিভ নয়।'

অমিত ওজর্ডস্‌ওঅর্থের কবিতা থেকে নজির পেড়ে বললে, 'প্রকৃতির সংসর্গে থাকতে থাকতে নির্বাক নিশ্চেতন পদার্থের ছাপ লেগে যায় দেহে মনে প্রাণে, যাকে কবি বলেছেন 'mute insensate things''

শনে সিসি ভাবলে, নির্বাক নিশ্চেতন পদার্থকে নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ নেই; যারা অত্যন্ত বেশি সচেতন আর যারা কথা কইবার মধুর প্রগল্ভতায় সুপটু তাদের নিয়েই আমাদের ভাবনা।

ওরা আশা করেছিল, লাভণ্য সম্পর্কে অমিত নিজেই কথা তুলবে। একদিন দুদিন তিনদিন যায়, সে একেবারে চুপ। কেবল একটা কথা আন্দাজে বোঝা গেল, অমিতর সাধের তরনী সম্প্রতি কিছু বেশিরকম টেউ খাচ্ছে। ওরা বিছানা থেকে উঠে তৈরি হবার আগেই অমিত কোথা থেকে ঘুরে আসে; তার পর মুখ দেখে মনে হয়, ঝোড়ো হাওয়ায় যে কলাগাছের পাতাগুলো ফালি ফালি হয়ে ঝুলছে তারই মতো শতদীর্ঘ ভাবখানা। আরো ভাবনার কথাটা এই যে, রবি ঠাকুরের বই কেউ কেউ ওর বিছানায় দেখেছে। ভিতরের পাতায় লাভণ্যর নাম থেকে গোড়ার অক্ষরটা লাল কালি দিয়ে কাটা। বোধ হয় নামের পরশপাথরেই জিনিসটার দাম বাড়িয়েছে।

অমিত ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে যায়। বলে, 'ষিদে সপ্তগ্রহ করতে চলেছি।' ষিদের জ্ঞেগানটা কোথায়, আর বিদেটা খুবই যে প্রবল, তা অন্যদের অগোচর ছিল না। কিন্তু তারা এমনি অবুঝের মতো ভাব করত যেন হাওয়ায় ক্ষুধাকরতা ছাড়া শিলঙে আর-কিছু আছে এ কথা কেউ ভাবতে পারে না। সিসি মনে মনে হাসে, কেটি মনে মনে জ্বলে। নিজের সমস্যাটাই অমিতর কাছে এত একান্ত যে, বাইরের কোনো চাক্ষুণ্য লক্ষ্য করার শক্তিই তার নেই। তাই সে নিঃসংকোচে সখীযুগলের কাছে বলে, 'চলেছি এক জলপ্রপাতের সন্ধানে।' কিন্তু প্রপাতটা কোন শ্রেণীর, আর তার গতিটা কোন অভিমুখী তা নিয়ে অন্যদের মনে যে কিছু ধোঁকা আছে তা সে বুঝতেই পারে না। আজ বলে গেল, এক জায়গায় কমলালেবুর মধু সওয়া করতে চলেছে। মেয়েদুটি নিতান্ত নিরীহভাবে সরল ভাষায় বললে, এই অপরূপ মধু সম্পর্কে তাদের দুর্দমনীয় কৌতুহল, তারাও সঙ্গে যেতে চায়। অমিত বললে পথ দুর্গম, যানবাহনের আয়ত্তাজীত। বলেই আলোচনাটাকে প্রথম অংশে ছেদন করেই দৌড় দিলে। এই মধুকরের ডানার চাক্ষুণ্য দেখে দুই বন্ধু স্থির করলে, আর দেরি নয়, আজই কমলালেবুর বাগানে অভিযান করা চাই। এ দিকে নরেন গেছে ষোড়দৌড়ের মাঠে। সিসিকে নিয়ে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ ছিল, সিসি গেল না। এই নিবৃত্তিতে তার কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদী ছাড়া অন্য কে বুঝবে ?

১৫

ব্যাঘাত

দুই সখী যোগমায়ার বাগানে বাইরের দরজা পার হয়ে চাকরদের কাউকে দেখতে পেলে না। গাড়িবারান্ডায় এসে চোখে পড়ল বাড়ির রোয়াকে একটি ছোটো টেমিল পেতে একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীতে মিলে পড়া চলছে। বুঝতে বাঁকি রইল না, এরই মধ্যে বড়োটি লাভণ্য।

কেটি টক টক করে উপরে উঠে ইংরেজিতে বললে, 'দুঃখিত।'

লাভণ্য চোকি ছেড়ে উঠে বললে, 'কাকে চান আপনারা?'

কেটি এক মুহূর্তে লাভণ্যর আপাদমস্তকে দৃষ্টিটাকে প্রবর ঝাঁটার মতো দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'মিস্টার অমিত্রায়ে এখানে এসেছেন কি না খবর নিতে এলুম।'

লাভণ্য হঠাৎ বুঝতেই পারলে না 'অমিত্রায়ে' কোন জাতের স্বীকৃতি। বললে, 'তাকে তো আমরা চিনি নে।'

অমনি দুই সখীতে একটা বিদ্যুচ্ছকিত চোখ-ঠারাঠারি হয়ে গেল, মুখে পড়ল একটা আড়হাসির রেখা। কেটি ঝঞ্জিয়ে উঠে মাথা নাড়া দিয়ে বললে, 'আমরা তো জানি এ বাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা আছে oftener than is good for him !'

ভাব দেখে লাবণ্য চমকে উঠল, বুঝলে এরা কে আর ও কী ভুলটাই করেছে। অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'কর্তামাকে ডেকে দিই, তাঁর কাছে ববর পাবেন।'

লাবণ্য চলে গেলেই সুরমাকে কেটি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার টিচার?'

'হাঁ।'

'নাম বুঝি লাবণ্য?'

'হাঁ।'

'গট ম্যাচেস?'

হঠাৎ দেশলাইয়ের প্রয়োজন আন্দাজ করতে না পেরে সুরমা কথাটার মানেই বুঝলে না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কেটি বললে, 'দেশলাই।'

সুরমা দেশলাইয়ের বার নিয়ে এল। কেটি সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে সুরমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ইংরেজি পড়?' সুরমা স্বীকৃতিসূচক মাথা নেড়েই ঘরের দিকে দ্রুত চলে গেল। কেটি বললে, 'গবর্নেসের কাছে মেয়েটা আর যাই শিখুক ম্যানারস্ শেবে নি।'

তার পরে দুই সখীতে টিপ্পনী চলল। 'ফেমাস লাবণ্য! ডিঙ্গীশস্! শিলঙ পাহাড়টাকে ভুলক্যানো বানিয়ে তুলেছে, ভূমিকম্পে অমিটের হৃদয়ডাঙায় ফাটল ধরিয়ে দিলে, এ ধার থেকে ও ধার। সিলি! মেন আর ফানি!'

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। এই হাসিতে ঔদার্য ছিল। কেননা, পুরুষমানুষ নির্বোধ বলে সিসির পক্ষে আক্ষেপের কারণ ঘটে নি। সে তো পাথুরে জমিতেও ভূমিকম্প ঘটিয়েছে, দিয়েছে একেবারে চৌচির করে। কিন্তু এ কী সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার! এক দিকে কেটির মতো মেয়ে, আর অন্য দিকে ঐ অদ্ভুত-ধরনে-কাপড়-পরা গবর্নেস! মুখে মাখন দিলে গলে না, যেন একতাল ভিজে ন্যাকড়া; কাছে বসলে মনটাতে বাদলার বিস্কুটের মতো ছাতা পড়ে যায়। কী করে অমিট ওকে এক মোফেটও সহ্য করে।

'সিসি, তোমার দাদার মনটা চিরদিন উপরে পা করে হাটে। কোন এক সৃষ্টিছাড়া উল্টো বুদ্ধিতে এই মেয়েটাকে হঠাৎ মনে হয়েছে এঞ্জেল।' এই বলে টেবিলে অ্যালেক্সব্রার বইয়ের গায়ে সিগারেটটা ঠেকিয়ে রেখে কেটি ওর রুপোর-শিকল-ওয়াল প্রসাধনের খলি বের করে মুখে একটুখানি পাউডার লাগালে, অঞ্জনের পেনসিল নিয়ে ভুরুর রেখাটা একটু ফুটিয়ে তুললে।

দাদার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় সিসির যথেষ্ট রাগ হয় না, এমন-কি, ভিতরে ভিতরে একটু যেন স্মেহই হয়। সমস্ত রাগটা পড়ে পুরুষদের মুগ্ধনয়নবিহারিণী মেকি এঞ্জেলদের পরে। দাদা সম্বন্ধে সিসির এই সকৌতুক ঔদাসীন্যে কেটির ধৈর্যভঙ্গ হয়। খুব করে ঝাঁকানি দিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

এমন সময়ে সাদা গরদের শাড়ি পরে যোগমায়া বেরিয়ে এলেন। লাবণ্য এল না। কেটির সঙ্গে এসেছিল ঝাঁকড়া-চুলে-দুইচোখ-আচ্ছন্নপ্রায় ক্ষুদ্রকায়্যা ট্যাবি-নাম-ধারী কুকুর। সে একবার ঘ্রাণের দ্বারা লাবণ্য ও সুরমার পরিচয় গ্রহণ করেছে। যোগমায়াকে দেখে হঠাৎ কুকুরটার মনে কিছু উৎসাহ জন্মালো। তাড়াতাড়ি গিয়ে সামনের দুটো পা দিয়ে যোগমায়ার নির্মল শাড়ির উপর পঙ্কিল স্বাক্ষর অঙ্কিত করে দিয়ে কৃত্রিম শ্রীতি জ্ঞাপন করলে। সিসি ঘাড় ধরে টেনে আনলে কেটির কাছে, কেটি তার নাকের উপর তঙ্গনী তাড়ন করে বললে, 'নটি ডগ!'

কেটি চৌকি থেকে উঠলই না। সিগারেট টানতে টানতে অত্যন্ত নির্লিপ্ত আড়ভাবে একটু ঘাড় ঝাঁকিয়ে যোগমায়াকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। যোগমায়ার পরে তার আক্রোশ বোধ করি লাবণ্যর চেয়েও বেশি। ওর ধারণা লাবণ্যর ইতিহাসে একটা ঝুঁত আছে। যোগমায়াই মাসি সঙ্গে অমিতর হাতে তাকে গতিয়ে দেবার কৌশল করছে। পুরুষ-মানুষকে ঠকাতে অধিক বুদ্ধির দরকার করে না, বিধাতার স্বহস্তে-তৈরি ঠুলি তাদের দুই চোখে পরানো।

সিসি সামনে এসে যোগমায়াকে নমস্কারের একটু আভাস দিয়ে বললে, 'আমি সিসি, অমির বোন।'

যোগমায়া একটু হেসে বললেন, 'অমি আমাকে মাসি বলে, সেই সম্পর্কে আমি তোমারও মাসি হই যা।'

কেটির রকম দেখে যোগমায়া তাকে লক্ষ্যই করলেন না। সিসিকে বললেন, 'এসো যা, ঘরে বসবে এসো।' সিসি বললে, 'সময় নেই, কেবল খবর নিতে এসেছি আমি এসেছে কিনা।'

যোগমায়া বললেন, 'এখনো আসে নি।'

'কখন আসবেন জানেন?'

'ঠিক বলতে পারি নে। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করে আসি গে।'

কেটি তার স্বস্থানে বসেই তীব্রভাবে বলে উঠল, 'যে মাস্টারনী এখানে বসে পড়াছিল সে তো ভান করলে অমিতকে সে কোনোকালে জানেই না।'

যোগমায়ার ধাঁধা লেগে গেল। বুঝলেন কোথাও একটা গোল আছে। এও বুঝলেন এদের কাছে মান রাখা শক্ত হবে। এক মুহুর্তে মাসিন্দ্র পরিহার করে বললেন, 'শুনেছি অমিতবাবু আপনাদের হোটেলেরি থাকেন, তাঁর ববর আপনাদেরই জানা আছে।'

কেটি বেশ একটু স্পষ্ট করেই হাসলে। তাকে ভাষায় বললে বোঝায়, লুকোতে পারো, ফাঁকি দিতে পারবে না।

আসল কথা, গোড়াতেই লাভণ্যকে দেখে এবং অমিকে সে চেনে না শুনে কেটি মনে মনে আগুন হয়ে আছে। কিন্তু সিসির মনে আশঙ্কা আছে মাত্র, জ্বালা নেই; যোগমায়ার সুন্দর মুখের গাভীর্য তার মনকে টেনেছিল। তাই, যখন দেখলে কেটি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়ে চৌকি ছাড়লে না, তার মনে কেমন সংকোচ লাগল। অথচ কোনো বিষয়ে কেটির বিরুদ্ধে যেতে সাহস হয় না, কেননা, কেটি সিডিশন দমন করতে ক্ষিপ্তহস্ত— একটু সে বিরোধ নয়। কর্কশ ব্যবহারে তার কোনো সংকোচ নেই। অধিকাংশ মানুষই ভীক, অকৃষ্টিত দুর্ব্যবহারের কাছে তারা হার মানে। নিজের অজ্ঞপ্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব আছে; যাকে সে মিষ্টিমুখো ভালোমানুষি বলে বন্ধুদের মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখলে তাকে সে অস্থির করে তোলে। রূঢ়তাকে সে অকপটতা বলে বড়াই করে, এই রূঢ়তার আঘাতে যারা সংকুচিত তারা কোনোমতে কেটিকে প্রসন্ন রাখতে পারলে আরাম পায়। সিসি সেই দলের— সে কেটিকে মনে মনে যতই ভয় করে ততই তার নকল করে; দেখাতে যায় সে দুর্বল নয়। সব সময় পেরে ওঠে না। কেটি আঙ্গ বুঝেছিল যে, তার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সিসির মনের কোণে একটা মুখচোরা আপত্তি লুকিয়ে ছিল। তাই সে ঠিক করেছিল, যোগমায়ার সামনে সিসির এই সংকোচ কড়া করে ভাঙতে হবে। চৌকি থেকে উঠল, একটা সিগারেট নিয়ে সিসির মুখে বসিয়ে দিলে, নিজের ধরানো সিগারেট মুখে করেই সিসির সিগারেট ধরাবার জন্যে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল। প্রত্যাখ্যান করতে সিসি সাহস করলে না। কানের ডগাটা একটুখানি লাল হয়ে উঠল। তবু জোর করে এমনি একটা ভাব দেখালে যেন তাদের হাল পাশ্চাত্যিকতায় যাদের ভ্র এতটুকু কৃষ্ণিত হবে তাদের মুখের উপর ও তুড়ি মারতে প্রস্তুত— that much for it !

ঠিক সেই সময়টাতে অমিত এসে উপস্থিত। মেয়েরা তা অবাক। হোটেল থেকে যখন সে বেরিয়ে এল মাথায় ছিল ফেস্ট হ্যাট, গায়ে ছিল বিলিতি কোর্তা। এখানে দেখা যাচ্ছে, পরনে তার ধূতি আর শাল। এই বেশান্তরের আড্ডা ছিল তার সেই কুটির। সেখানে আছে একটি বইয়ের শেলফ, একটি কাপড়ের তোরাঙ্গ, আর যোগমায়ার দেওয়া একটি আরাম-কোদারা। হোটেল থেকে মধ্যাহ্নভোজন সেবে এইখানে সে আশ্রয় নেয়। আঙ্গকাল লাভণ্যর শাসন কড়া, সুরমাঝে পড়ানোর সময়ের মাঝখানটাতে জ্বলপ্রপাত বা কমলালেবুর সন্ধানে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সেইজন্য বিকেলে সাড়ে চারটে বেলায় চা-পান-সভার পূর্বে এ বাড়িতে দৈহিক মানসিক কোনোপ্রকার তৃষ্ণা-নিবারণের সৌজন্যসম্মত সুযোগ অমিতের ছিল না। এই সময়টা কোনোমতে কাটিয়ে কাপড় ছেড়ে যথানিদিষ্ট সময়ে এখানে সে আসত।

আঙ্গ হোটেল থেকে বেরোবার আগেই কোলকাতা থেকে এসেছে তার আংটি। কেমন করে সে সেই আংটি লাভণ্যকে পরাবে তার সমস্ত অনুষ্ঠানটা সে বসে বসে কল্পনা করেছে। আঙ্গ হল ওর একটা বিশেষ দিন। এ দিনকে দেউড়িতে বসিয়ে রাখা চলবে না। আঙ্গ সব কাজ বন্ধ করা চাই। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে লাভণ্য যেখানে পড়াচ্ছে সেইখানে গিয়ে বলবে, 'একদিন হাতিতে চড়ে বাদশা এসেছিল, কিন্তু তোরাণ ছোটো, পাছে মাথা হেঁট করতে হয় তাই সে ফিরে গেছে, নতুন-তেরি প্রাসাদে প্রবেশ করে নি। আঙ্গ এসেছে আমাদের একটা মহাদিন, কিন্তু তোমার অবকাশের তোরাণটা তুমি বাটো করে রেখেছ— সেটাকে ভাঙো, রাজা মাথা তুলেই তোমার ঘরে প্রবেশ করুন।'

অমিত এ কথাও মনে করে এসেছিল যে ওকে বলবে, 'ঠিক সময়টাতে আসাকেই বলে পাঙ্কচুমালিটি; কিন্তু ঘড়ির সময় ঠিক সময় নয়; ঘড়ি সময়ের নম্বর জানে, তার মূল্য জানবে কী করে?'

অমিত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, মেঘে আকাশটা ম্লান, আলোর চেহারাটা বেলা পাঁচটা-ছটার মতো। অমিত ঘড়ি দেখলে না, পাছে ঘড়িটা তার অভদ্র ইশারায় আকাশের প্রতিবাদ করে— যেমন বহুদিনের ছোঁরো রোগীর মা ছেলের গা একটু ঠাণ্ডা দেখে আর থার্মোমিটার মিলিয়ে দেখতে সাহস করে না। আজ অমিত এসেছিল নির্দিষ্ট সময়ের যথেষ্ট আগে। কারণ, দুরাশা নির্লজ্জ।

বারম্ভার যে কোণটায় বসে লাভণ্য তার ছাত্রীকে পড়ায়, রাস্তা দিয়ে আসতে সেটা চোখে পড়ে। আন্ধ দেখলে সে জায়গাটা খালি। মন আনন্দে লাকিয়ে উঠল। এতক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে। এখনো তিনটে বেজে বিশ মিনিট। সেদিন ও লাভণ্যকে বলেছিল, 'নিয়মপালনটা মানুষের, অনিয়মটা দেবতার; মর্তে আমরা নিয়মের সাধনা করি স্বর্গে অনিয়ম-অমৃতে অধিকার পাব বলেই। সেই স্বর্গ মাঝে মাঝে মর্তেই দেখা দেয়, তখন নিয়ম ভেঙে তাকে সেলাম করে নিতে হয়।' আশা হল, লাভণ্য নিয়ম-ভাঙার গৌরব বুঝেছে বা; লাভণ্যর মনের মধ্যে হঠাৎ আন্ধ বৃষ্টি কেমন করে বিশেষ দিনের স্পর্শ লেগেছে, সাধারণ দিনের বেড়া গেছে ভেঙে।

নিকটে এসে দেখে, যোগমায়া তাঁর ঘরের বাইরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে, আর সিসি তার মুখের সিগারেট কেটির মুখের সিগারেট থেকে ছালিয়ে নিচ্ছে। অসম্মান যে ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে বাকি রইল না। ট্যাবি-কুকুরটা তার প্রথম মৈত্রীর উচ্ছ্বাসে বাধা পেয়ে কেটির পায়ের কাছে শুয়ে একটু নিদ্রার চেষ্টা করছিল। অমিতর আগমনে তাকে সম্বর্ধনা করবার জন্যে আবার অসংযত হয়ে উঠল। সিসি আবার তাকে শাসনের দ্বারা বৃষ্টিয়ে দিলে যে এই সদভাব-প্রকাশের প্রণালীটা এখনে সমাদৃত হবে না।

দুই সখীর প্রতি দুরুপাত মাত্র না করে 'মাসি' বলে দূর থেকে ডেকেই অমিত যোগমায়ার পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। এ সময়ে এমন করে প্রণাম করা তার প্রথার মধ্যে ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, 'মাসিমা, লাভণ্য কোথায়?'

'কী জানি বাছা, ঘরের মধ্যে কোথায় আছে।'

'এখনো তো তার পড়বার সময় শেষ হয় নি।'

'বোধ হয় ঐরা আসাতে ছুটি নিয়ে ঘরে গেছে।'

'চলো, একবার দেখে আসি সে কী করছে।'

যোগমায়াকে নিয়ে অমিত ঘরে গেল। সম্মুখে যে আর কোনো সজীব পদার্থ আছে সেটা সম্পূর্ণই অস্বীকার করলে।

সিসি একটু ঠেঁচিয়ে বলে উঠল, 'অপমান! চলো কেটি, ঘরে যাই।'

কেটিও কম জ্বলে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে সে যেতে চায় না।

সিসি বললে, 'কোনো ফল হবে না।'

কেটির বড়ো বড়ো চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল; বললে, 'হতেই হবে ফল।'

আরো খানিকটা সময় গেল। সিসি আবার বললে, 'চলো ভাই, আর একটুও থাকতে হচ্ছে করছে না।'

কেটি বারম্ভায় ধরা দিয়ে বসে রইল। বললে, 'এইখান দিয়ে তাকে বেরোতেই তো হবে।'

অবশেষে বেরিয়ে এল অমিত, সঙ্গে নিয়ে এল লাভণ্যকে। লাভণ্যর মুখে একটা নির্লিপ্ত শান্তি। তাতে একটুও রাগ নেই, স্পর্ধা নেই, অভিমান নেই। যোগমায়া পিছনের ঘরেই ছিলেন, তাঁর বেরোবার ইচ্ছা ছিল না। অমিত তাঁকে ধরে নিয়ে এল। এক মুহূর্তের মধ্যেই কেটির চোখে পড়ল, লাভণ্যর হাতে আংটি। মাথায় রক্ত চন করে উঠল, লাল হয়ে উঠল দুই চোখ, পৃথিবীটাকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল।

অমিত বললে, 'মাসি, এই আমার বোন শমিতা, বাবা বোধ হয় আমার নামের সঙ্গে ছদ্ম মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন কিন্তু রয়ে গেল অমিত্রাক্ষর। ইনি কেতকী, আমার বোনের বন্ধু।'

ইতিমধ্যে আর-এক উপদ্রব। সুরমার এক পোষা বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে আসাতেই ট্যাবির কুকুরীয় নীতিতে সে এই স্পর্ধাটাকে যুদ্ধঘোষণার বৈধ কারণ বলেই গণ্য করলে। একবার অগ্রসর হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করে, আবার বিড়ালের উদাত্ত নখর ও ফোঁসফোঁসানিতে যুদ্ধের আশু ফল সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ে ফিরে আসে; এমন অবস্থায় কিঞ্চিৎ দূর হতেই অহিংস গর্জননীতিই নিরাপদ বীরত্ব-প্রকাশের উপায় মনে করে অপরিমিত চীৎকার শুরু করে দিলে। বিড়ালটা তার কোনো প্রতিবাদ না করে পিঠ ফুলিয়ে চলে গেল। এইবার কেটি সহ্য করতে পারলে না। প্রবল আক্রোশে কুকুরটাকে কান-মলা দিতে লাগল। এই কান-মলার অনেকটা অংশই নিজের ভাগ্যের উদ্দেশ্যে। কুকুরটা কেঁই কেঁই স্বরে অসদব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র অভিমত জানালে। ভাগ্য নিঃশব্দে হাসল।

এই গোলমালটা একটু ধামলে পর অমিত সিসিকে লক্ষ্য করে বললে, 'সিসি, ঐরই নাম লাভণ্য। আমার কাছ থেকে ঐর নাম কখনো শোন নি, কিন্তু বোধ হচ্ছে আর-দশজনের কাছ থেকে শুনেছ। ঐর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, কলকাতায়, অস্থান মাসে।'

কেটি মুখে হাসি টেনে আনতে দেরি করলে না। বললে, 'আই কনগ্র্যাচুলেট। কমলালেবুর মধু পেতে বিশেষ বাধা হয় নি বলেই ঠেকছে; রাস্তা কঠিন নয়, মধু লাফ দিয়ে আপনি এগিয়ে এসেছে মুখের কাছে।'

সিসি তার স্বাভাবিক অভ্যাসমত হী হী করে হেসে উঠল।

লাভণ্য বুঝলে, কথাটা ঠাট্টা আছে, কিন্তু যান্টা সম্পূর্ণ বুঝলে না।

অমিত তাকে বললে, 'আজ বেরোবার সময় এরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল 'কোথায় যাচ্ছ'। আমি বলেছিলুম 'বন্য মধুর সন্ধানে'। তাই এরা হাসছে। ওটা আমারই দোষ; আমার কোন্ কথাটা যে হাসির নয় লোকে সেটা ঠাওরাতে পারে না।'

কেটি শান্ত স্বরেই বললে, 'কমলালেবুর মধু নিয়ে তোমার তো জিত হল, এবার আমারও যাতে হার না হয় সেটা করো।'

'কী করতে হবে বলো।'

'নরেনের সঙ্গে আমার একটা বাজি আছে। সে বলেছিল, জেটলমান্নার যেখানে যায় কেউ সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে না, কিছুতেই তুমি রেস দেখতে যাবে না। আমি আমার এই হীরের আংটি বাজি রেখে বলেছিলুম, তোমাকে রেসে নিয়ে যাবই। এ দেশে যত ঝর্না, যত মধুর দোকান আছে, সব সন্ধান করে শেষকালে এখানে এসে তোমার দেখা পেলুম। বলো—না ভাই সিসি, কত ফিরতে হয়েছে বুনো হাঁস শিকারের চেষ্টায়, ইংরেজিতে যাকে বলে wild goose।'

সিসি কোনো কথা না বলে হাসতে লাগল। কেটি বললে, 'মনে পড়ছে সেই গল্পটা, একদিন তোমার কাছেই শুনেছি অমিট। কোন্ পার্সিয়ান ফিলছফার তার পাগড়িচোরের সন্ধান না পেয়ে শেষে গোরস্থানে এসে বসেছিল। বলেছিল পালাবে কোথায়? মিস্ লাভণ্য যখন বলেছিলেন ওকে চেনেন না, আমাকে ধোঁকা লাগিয়ে দিয়েছিল; কিন্তু আমার মন বললে ঘুরে ফিরে ওকে ওর এই গোরস্থানে আসতেই হবে।'

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

কেটি লাভণ্যকে বললে, 'অমিট আপনার নাম মুখে আনলে না, মধুর ভাষাতে ঘুরিয়ে বললে কমলালেবুর মধু; আপনার বুদ্ধি খুবই বেশি সরল, ঘুরিয়ে বলবার কৌশল মুখে জোগায় না, ফস করে বলে ফেললেন অমিটকে জানেনই না। তবু সানডে-স্কুলের বিধানমত ফল ফলন না, দণ্ডদাতা আপনাদের কোনো দণ্ডই দিলেন না, শক্ত পথের মধুও একজন এক চুমুকেই খেয়ে নিলেন, আর অজ্ঞানকেও একজন এক দৃষ্টিতে জানলেন— এখন কেবল আমার ভাগ্যেই হার হবে? দেখো তো সিসি, কী অন্যায়!'

সিসির আবার সেই উচ্চহাসি। ট্যানি-কুকুরটাও এই উচ্ছ্বাসে যোগ দেওয়া তার সামাজিক কর্তব্য মনে করে বিচলিত হবার লক্ষণ দেখালে। তৃতীয়বার তাকে দমন করা হল।

কেটি বললে, 'অমিট, তুমি জান, এই হীরের আংটি যদি হারি স্জগতে আমার সন্ধান থাকবে না। এ আংটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক মুহূর্ত হাত থেকে বুলি নি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শেষকালে আঙ্গ এই শিলঙ পাহাড়ে কি একে বাজিতে খোওয়াতে হবে?'

সিসি বললে, 'বাজি রাখতে গেলে কেন ভাই!'

'মনে মনে নিজের উপর অহংকার ছিল, আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস। অহংকার ডাঙল, এবারকার মতো আমার রেস ফুরোল, আমারই হার। মনে হচ্ছে অমিটকে আর রাজি করতে পারব না। তা, এমন অদ্ভুত করেই যদি হারাবে সেদিন এত আদরে আংটি দিয়েছিলে কেন? সে দেওয়ার মধ্যে কি কোনো ঝাঁক ছিল না? এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে, আমার অপমান কোনোদিন তুমি ঘটতে দেবে না?'

বলতে বলতে কেটির গলা ভার হয়ে এল, অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে নিলে।

আজ সাত বৎসর হয়ে গেল, কেটির বয়স তখন আঠারো। সেদিন এই আংটি অমিত নিজের আঙুল থেকে খুলে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল। তখন ওরা দুজনেই ছিল ইংলন্ডে। অক্সফোর্ডে একজন পাঞ্জাবি যুবক ছিল কেটির প্রণয়মুখু। সেদিন আপসে অমিত সেই পাঞ্জাবির সঙ্গে নদীতে বাচ বেলেছিল। অমিতরই হল জিত। জুন মাসের জ্যেষ্ঠমাস্য সমস্ত আকাশ যেন কথা বলে উঠেছিল, মাঠে মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্র্যে ধরণী তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। সেই ক্ষণে অমিত কেটির হাতে আংটি পরিয়ে দিলে; তার মধ্যে অনেক কথাই উহা ছিল, কিন্তু কোনো কথাই গোপন ছিল না। সেদিন কেটির মুখে প্রসাধনের প্রলেপ লাগে নি, তার

হাসিটি সহজ ছিল, ভাবের আবেগে তার মুখ রক্তিম হতে বাধা পেত না। আংটি হাতে পরা হলে অমিত তার কানে কানে বলেছিল—

Tender is the night
And haply the queen moon
is on her throne.

কেটি তখন বেশি কথা বলতে শেখে নি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেবল যেন মনে মনে বলেছিল 'মন'আমী', ফরাসি ভাষায়, যার নাম হচ্ছে 'বঁধু'।

আজ্জ অমিতর মুখেও জ্বাবর বেধে গেল। ভেবে পোলে না কী বলবে।

কেটি বললে, 'বাজিতে যদিই হারলুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক্ অমিট। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেব না।'

বলে আংটি খুলে টেবিলটার উপর রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেল। এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দর্ দর্ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

১৬

মুক্তি

একটি ছোটো চিঠি এল লাভণ্যর হাতে, শোভনলালের লেখা—

শিলঙে কাল রাতে এসেছি। যদি দেখা করতে অনুমতি দাও তবে দেখতে যাব। না যদি দাও কালই ফিরব। তোমার কাছে শান্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে কী অপরাধ করেছি আজ্জ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে পারি নি। আজ্জ এসেছি তোমার কাছে সেই কথাটি শোনবার জন্যে, নইলে মনে শান্তি পাই নে। ভয় কোরো না। আমার আর-কোনো প্রার্থনা নেই।

লাভণ্যর চোখ জলে ভরে এল। মুছে ফেললে, চুপ করে বসে ফিরে তাকিয়ে রইল নিজের অতীতের দিকে। যে অঙ্কুরটা বড়ো হয়ে উঠতে পারত, অথচ যেটাকে চেপে দিয়েছে, বাড়ত দেয় নি, তার সেই কচিবেলাকার করুণ ভীকুতা ওর মনে এল। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার করে তাকে সফল করতে পারত। কিন্তু সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব, বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালোবাসাকে দুর্বলতা বলে মনে মনে ধিক্কার দিয়েছে। ভালোবাসা আজ্জ তার শোধ নিলে, অভিমান হল ধূলিসাৎ। সেদিন যা সহজে হতে পারত নিশ্বাসের মতো, সরল হাসির মতো, আজ্জ তা কঠিন হয়ে উঠল; সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দু হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ্জ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতে বুক ফেটে যায়। মনে পড়ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ডিত ব্যথিত মূর্তি। তার পরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসা এতদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইল? আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।

লাভণ্য চিঠিতে লিখলে—

তুমি আমার সকলের বড়ো বন্ধু। এ বন্ধুত্বের দাম দিতে পারি এমন ধন আজ্জ আমার হাতে নেই। তুমি কোনোদিন দাম চাও নি; আজ্জও তোমার যা দেবার জিনিস তাই দিতে এসেছ কিছুই দাবি না করে! চাই নে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহংকারও নেই।

চিঠিটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে এমন সময় অমিত এসে বললে, 'বন্যা, চলো আজ্জ দুজনে একবার বেড়িয়ে আসি গে।'

অমিত ভয়ে-ভয়েই বলেছিল; ভেবেছিল লাভণ্য আজ্জ হয়তো যেতে রাজি হবে না।

লাভণ্য সহজেই বললে, 'চলো।'

দুজনে বোরোল। অমিত কিছু দ্বিধার সঙ্গেই লাভণ্যর হাতটিকে হাতের মধ্যে নেবার চেষ্টা করলে। লাভণ্য একটুও বাধা না দিয়ে হাত ধরতে দিলে। অমিত হাতটি একটু জোরে চেপে ধরলে, তাতেই মনের কথা যেটুকু

ব্যক্ত হয় তার বেশি কিছু মুখে এল না। চলতে চলতে সেদিনকার সেই জায়গাতে এল যেখানে বনের মধ্যে হঠাৎ একটুখানি ফাঁক। একটি তরুশূন্য পাহাড়ের শিখরের উপর সূর্য আপনার শেষ স্পর্শ ঠেকিয়ে নেমে গেল। অতি সুকুমার সবুজের আভা আস্তে আস্তে সুকোমল নীলে গেল মিলিয়ে। দুজনে খেমে সে দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লাবণ্য আস্তে আস্তে বললে, 'একদিন একজনকে যে আংটি পরিয়েছিলে, আমাকে দিয়ে আজ সে আংটি খোলালে কেন?'

অমিত ব্যাখ্যাত হয়ে বললে, 'তোমাকে সব কথা বোঝাব কেমন করে বন্যা? সেদিন যাকে আংটি পরিয়েছিলুম আর যে আজ সেটা খুলে দিলে তারা দুজনে কি একই মানুষ?'

লাবণ্য বললে, 'তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্তার আদরে তৈরি, আর একজন তোমার অনাদরে গড়া।'

অমিত বললে, 'কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যে আঘাতে আজকের কেটি তৈরি, তার দায়িত্ব কেবল আমার একনার নয়।'

'কিন্তু মিতা, নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল তাকে তুমি আপনার করে রাখলে না কেন? যে কারণেই হোক, আগে তোমার মুঠো আলগা হয়েছে, তার পরে দশের মুঠোর চাপ পড়েছে ওর উপরে, ওর মূর্তি গেছে বদলে। তোমার মন একদিন হারিয়েছে বলেই দশের মনের মতো করে নিজেকে সাজাতে বসল। আজ তো দেখি ও বিলিতি দোকানের পুতুলের মতো; সেটা সম্ভব হত না যদি ওর হৃদয় বেঁচে থাকত। থাকে গে ও-সব কথা। তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। রাখতে হবে।'

'বলো, নিশ্চয় রাখব।'

'অস্বস্ত হৃৎস্থানেকের জন্যে তোমার দলকে নিয়ে তুমি চেরাপুঞ্জিতে বেরিয়ে এসো। ওকে আনন্দ দিতে নাও যদি পারো, ওকে আমোদ দিতে পারবে।'

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'আচ্ছা।'

তার পরে লাবণ্য অমিতের বৃকে মাথা রেখে বললে, 'একটা কথা তোমাকে বলি মিতা, আর কোনোটিন বলব না। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ করে বলছি নে, আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়েই বলছি, আমাকে তুমি আংটি দিয়ে না, কোনো চিহ্ন রাখবার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাকে নিরঞ্জন— বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।'

এই বলে নিজের আঙুলের থেকে আংটি খুলে অমিতের আঙুলে আস্তে আস্তে পরিয়ে দিলে। অমিত তাতে কোনো বাধা দিলে না।

সায়াক্ষের এই পৃথিবী যেমন অন্তরশি—উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলে ধরেছে, তেমনি নীরবে, তেমনি শান্ত দীপ্তিতে লাবণ্য আপন মুখ তুলে ধরলে, অমিতের নত মুখের দিকে।

সাত দিন যেতেই অমিত ফিরে যোগমায়ার সেই বাসায় গেল। ঘর বন্ধ, সবাই চলে গেছে। কোথায় গেছে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি।

সেই যুক্যালিপিস্টাস তলায় অমিত এসে দাঁড়াল, খানিকক্ষণ ধরে শূন্যমনে সেইখানে ঘুরে বেড়ালে। পরিচিত মালী এসে সেলাম করে জিজ্ঞাসা করলে, 'ঘর খুলে দেব কি? ভিতরে বসবেন?'

অমিত একটু দ্বিধা করে বললে, 'হ্যাঁ।'

ভিতরে গিয়ে লাবণ্যের বসবার ঘরে গেল। চৌকি টেবিল শেলফ আছে, সেই বইগুলি নেই। মেজের উপর দুই-একটা ছেঁড়া শূন্য লেফাফা, তার উপরে অজানা হাতের অক্ষরে লাবণ্যের নাম ও ঠিকানা লেখা; দু-চারটে ব্যবহার-করা পরিত্যক্ত নিব এবং ক্ষয়প্রাপ্ত একটি অতি ছোটো পেন্সিল টেবিলের উপরে। পেন্সিলটি পকেটে নিলে। এর পাশেই শোবার ঘর। লোহার খাটে কেবল একটা গদি, আর আয়নার টেবিলে একটা শূন্য তেলের শিশি। দুই হাতে মাথা রেখে অমিত সেই গদির উপর শুয়ে পড়ল, লোহার খাটটা শব্দ করে উঠল। সেই ঘরটার মধ্যে বোবা একটা শূন্যতা। তাকে প্রশ্ন করলে কোনো কথাই বলতে পারে না। সে একটা মূর্ছা, যে মূর্ছা কোনোটিনই আর ভাঙবে না।

তার পরে শরীর-মনের উপর একটা নিরুদ্যমের বোঝা বহন করে অমিত গেল নিজের কুটির। যা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনিই সব আছে। এমন-কি, যোগমায়া তাঁর কেদারাটিও ফিরিয়ে নিয়ে যান নি। বুঝলে,

তিনি স্নেহ করেই এই চৌকিটি তাকে দিয়ে গেছেন; মনে হল যেন শুনতে পেলো শান্ত মধুর স্বরে তাঁর আত্মনা— 'বাহা !' সেই চৌকির সামনে মাথা লুটিয়ে অমিত প্রণাম করলে।

সমস্ত শিল্প পাহাড়ের শ্রী আজ চলে গেছে। অমিত কোথাও আর সান্দ্রনা পেল না।

১৭

শেষের কবিতা

কোলকাতার কলেজে পড়ে যতিশংকর। থাকে কলুটোলা প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে। অমিত তাকে প্রায় বাড়িতে নিয়ে আসে, খাওয়ায়, তার সঙ্গে নানা বই পড়ে, নানা অদ্ভুত কথায় তার মনটাকে চমকিয়ে দেয়, মোটের করে তাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

তার পর কিছুকাল যতিশংকর অমিতের কোনো নিশ্চিত খবর পায় না। কখনো শোনে সে নৈনিতালে, কখনো উটকামণ্ডে। একদিন শুনলে, অমিতের এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলছে, সে আজকাল কেটি মিত্রের বাইরেরকার রঙটা ঘোচাতে উঠেপড়ে লেগেছে। কাজ পেয়েছে মনের মতো, বর্ণাস্তর করা। এতদিন অমিত মূর্তি গড়বার শখ মেটাত কথা দিয়ে, আজ পেয়েছে সজীব মানুষ। সে মানুষটিও একে একে আপন উপরকার রঙিন পাপড়িগুলো খসাতে রাজি, চরমে ফল ধরবে আশা করে। অমিতের বোন লিসি নাকি বলছে যে, কেটিকে একেবারে চেনাই যায় না, অর্থাৎ তাকে নাকি বড়ডো বেশি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। বন্ধুদের সে বলে দিয়েছে তাকে কেতকী বলে ডাকতে। এটা তার পক্ষে নির্লজ্জতা, যে মেয়ে একদা ফিন্‌ফিনে শান্তিপুুরে শাড়ি পরত সেই লজ্জাবতীর পক্ষে জামা-শেমিঙ্গ পরারই মতো। অমিত তাকে নাকি নিভুতে ডাকে কেয়া বলে। এ কথাও লোকে কানাকানি করছে যে, নৈনিতালের সরোবরে নৌকা ভাসিয়ে কেটি তার হাল ধরেছে, আর অমিত তাকে পড়ে শোনাচ্ছে রবি ঠাকুরের 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা'। কিন্তু, লোকে কী না বলে? যতিশংকর বুঝে নিলে, অমিতের মনটা পাল তুলে চলে গেছে ছুটিতম্বের মাঝদরিয়ায়।

অবশেষে অমিত ফিরে এল। শহরে রাষ্ট্র, কেতকীর সঙ্গে তার বিয়ে। অথচ অমিতের নিজ মুখে একদিনও যতি এ প্রসঙ্গ শোনে নি। অমিতের ব্যবহারেও অনেকখানি বদল ঘটেছে। পূর্বের মতোই যতিকে অমিত ইংরেজি বই কিনে উপহার দেয়, কিন্তু তাকে নিয়ে সঙ্কেবেলায় সে-সব বইয়ের আলোচনা করে না; যতি বুঝতে পারে, আলোচনার ধারাটা এখন বইছে এক নতুন খাদে। আজকাল মোটের বেড়াতে সে যতিকে ডাক পাড়ে না। যতির বয়সে এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে, অমিতের 'নিরুদ্দেশ-যাত্রার' পার্টিতে তৃতীয় ব্যক্তির জায়গা হওয়া অসম্ভব।

যতি আর থাকতে পারলে না। অমিতকে নিজেই গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'অমিতদা, শুনলুম মিস কেতকী মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে !'

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'লাবণ্য কি এ খবর জেনেছে?'

'না, আমি তাকে লিখি নি। তোমার মুখে পাকা খবর পাই নি বলে চুপ করে আছি।'

'খবরটা সত্যি, কিন্তু লাবণ্য হয়তো-বা ভুল বুঝবে।'

যতি হেসে বললে, 'এর মধ্যে ভুল বোঝবার জায়গা কোথায়? বিয়ে কর যদি তো বিয়েই করবে, সোজা কথা।'

'দেখো যতি, মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয়। আমরা ডিক্‌শনারিতে যে কথার এক মানে বেঁধে দিই, মানব-জীবনের মধ্যে মানোটা সাতখানা হয়ে যায় সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো।'

যতি বললে, 'অর্থাৎ, তুমি বলছ বিবাহ মানে বিবাহ নয়?'

'আমি বলছি বিবাহের হাজারখানা মানে। মানুষের সঙ্গে মিশে তার মানে হয়, মানুষকে বাদ দিয়ে তার মানে বের করতে গেলেই ধাঁধা লাগে।'

'তোমার বিশেষ মানোটাই হলো-না।'

'সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না, জীবন দিয়ে বলতে হয়। যদি বলি ওর মূল মানোটা ভালোবাসা তা হলেও আর-একটা কথায় গিয়ে পড়বে; ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরো বেশি জ্যাস্ত।'

'তা হলে, অমিতদা, কথা বন্ধ করতে হয় যে। কথা কাঁধে নিয়ে মানের পিছন পিছন ছুটবে, আর মানেরটা ঝাড়ে তড়া করলে ডাইনে আর ডাইনে তড়া করলে ঝাড়ে মারবে দৌড়, এমন হলে তো কাজ চলে না।'

'ভায়া, মন্দ বল নি। আমার সঙ্গে থেকে তোমার মুখ ফুটেছে। সংসারে কোনোমতে কাজ চালাতেই হবে, তাই কথার নেহাত দরকার। যে-সব সত্যকে কথার মধ্যে কুলায় না, ব্যবহারের হাটে তাদেরই ছাঁট, কথাটাকেই জ্বাহির করি। উপায় কী? তাতে বোঝাপড়া ঠিক না হোক, চোখ বুজে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।'

'তবে কি আজকের কথাটাকে একেবারে খতম করতে হবে।'

'এই আলোচনাটা যদি নিতান্তই জ্ঞানের গরজে হয়, প্রাণের গরজে না হয়, তা হলে খতম করতে দোষ নেই।'

'ধরে নাও—না প্রাণের গরজেই।'

'শাবাশ, তবে শোনো।'

এইখানে একটু পাদটীকা লাগালে দোষ নেই। অমিতর ছোটো বোন লিসির স্বহস্তে ঢালা চা যতি আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই পান করে আসছে। অনুমান করা যেতে পারে যে, সেই কারণেই গুর মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই যে, অমিত ওর সঙ্গে অপরাহ্নে সাহিত্যালোচনা এবং সায়াহ্নে মোটরে করে বেড়ানো বন্ধ করেছে। অমিতকে ও সর্বাস্তুরূপে ক্ষমা করেছে।

অমিত বললে, 'অলিঙ্কেন এক ভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হলে প্রাণ বাঁচে না; আবার অলিঙ্কেন আর—এক ভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বলতে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার— দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। এখন বুঝতে পেরেছ?'

'সম্পূর্ণ না, তবে কিনা বোঝাবার ইচ্ছে আছে।'

'যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব—কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।'

'তোমার কথা ঠিক বুঝছি কি না সেইটেই বুঝতে পারি নে। আর—একটু স্পষ্ট করে বলা অমিতদা।'

অমিত বললে, 'একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ; আজ আমি পেয়েছি আমার ছোটো বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল।'

'কিন্তু বিবাহে তোমার ঐ সঙ্গ—আসঙ্গ কি একত্রেই মিলতে পারে না?'

'জীবনে অনেক সুযোগ ঘটেতে পারে, কিন্তু ঘটে না। যে মানুষ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভালো; যে তা না পায়, দৈবক্রমে তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সেও বড়ো কম সৌভাগ্য নয়।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু তুমি যাকে মনে কর রোম্যান্স সেইটেতে কমতি পড়ে। একটুও না। গল্পের বই থেকেই রোম্যান্সের ঝাঝ বরাদ্দ ছাঁচে ঢালানি করে জোগাতে হবে নাকি? কিছুতেই না। আমার রোম্যান্স আমিই সৃষ্টি করব। আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোম্যান্স, আমার মর্তেও ঘটাও রোম্যান্স। যারা ওর একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আর—একটাকে দেউলে করে দেয় তাদেরই তুমি বল রোম্যান্টিক! তারা হয় মাছের মতো জলে সাঁতার দেয়, নয় বেড়ালের মতো ডাঙায় বেড়ায়, নয় বাদুড়ের মতো আকাশে ফেরে। আমি রোম্যান্সের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জ্বলে—জ্বলেও উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও। নদীর চরে রইল আমার পাকা দখল, আবার মানসের দিকে যখন যাত্রা করব সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়। জয় হোক আমার লাভণ্যর, জয় হোক আমার কেতকীর, আর সব দিক থেকেই ধন্য হোক অমিত রায়।'

যতি শুদ্ধ হয়ে বসে রইল, বোধ করি কথাটা তার ঠিক লাগল না। অমিত তার মুখ দেখে ঈষৎ হেসে বললে, 'দেখো ভাই, সব কথা সকলের নয়। আমি যা বলছি হয়তো সেটা আমারই কথা। সেটাকে তোমার কথা বলে বুঝতে গেলেই ভুল বুঝবে, আমাকে গাল দিয়ে বসবে। একের কথার উপর আরের মানে চাপিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়। এবার আমার নিজের কথাটা স্পষ্ট করেই নাহয় তোমাকে বলি। রূপক দিয়েই বলতে হবে, নইলে এ—সব কথার রূপ চলে যায়, কথাগুলো লজ্জিত হয়ে ওঠে। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই; কিন্তু সে যেন ঘড়ায়—তোলা জ্বল, প্রতিদিন জ্বল, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর

লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিছি; সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সঁাতার দেবে।’
 যতি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে, ‘কিন্তু অমিতদা, দুটোর মধ্যে একটাকেই বেছে নিতে হয় না?’
 ‘যার হয় তারই হয়, আমার হয় না।’
 ‘কিন্তু শ্রীমতী কেতকী যদি—’
 ‘তিনি সব জানেন। সম্পূর্ণ বোঝেন কি না বলতে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাব
 যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছি নে। এও তাঁকে বুঝতে হবে যে লাবণ্যর কাছে তিনি ঋণী।’
 ‘তা হোক, শ্রীমতী লাবণ্যকে তো তোমার বিয়ের খবর জানাতে হবে।’
 ‘নিশ্চয় জানাব। কিন্তু তার আগে একটি চিঠি দিতে চাই, সেটি তুমি পৌছিয়ে দেবে?’
 ‘দেব।’

অমিতর এই চিঠি—

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রাস্তার শেষে এসে যখন দাঁড়ালুম, কবিতা দিয়ে যাত্রা শেষ করেছি। আন্ধ্রও
 এসে খামলুম একটা রাস্তার শেষে। এই মুহূর্তটির উপর একটি কবিতা রেখে যেতে চাই।
 আর—কোনো কথার ভার সহিবে না। হতভাগা নিবারণ চক্রবর্তীটা যেদিন ধরা পড়েছে সেদিন
 মরেছে, অতি শৌখিন জ্বলচর মাছের মতো। তাই উপায় না দেখে তোমারই কবির উপর ভার
 দিলুম আমার শেষ কথাটা তোমাকে জানাবার জন্যে—

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরস্বপ্ন,
 অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার অস্তিত্ব আগমন।
 লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি,
 আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি।
 জীবন আধার হল সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
 সন্ধ্যার দেউলদীপ চিস্তের মন্দিরে তব দান।
 বিচ্ছেদের হোমবহি হতে
 পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।

মিতা

তার পরেও আরো কিছুকাল গেল। সেদিন কেতকী গেছে তার বোনের মেয়ের অন্নপ্রাশনে। অমিত গেল না।
 আরাম—কেদারায় বসে সামনে চৌকিতে পা—দুটো তুলে দিয়ে বিলিয়ম জেমসের পত্রাবলী পড়েছে। এমন সময়
 যতিশঙ্কর লাবণ্যর লেখা এক চিঠি তার হাতে দিলে। চিঠির এক পাতে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিবাহের
 খবর। বিবাহ হবে ছ মাস পরে, জ্যৈষ্ঠ মাসে, রামগড়পর্বতের শিখরে। অপর পাতে—

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
 তারি রথ নিত্যই উধাও
 জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন—
 চক্রে পিষ্ট আধারের বন্ধ—ফাটা তারার ত্রন্দন।
 ওগো বন্ধু,
 সেই ধাবমান কাল
 জড়িয়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল—
 তুলে নিল দ্রুতরথে
 দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
 তোমা হতে বহু দূরে।
 মনে হয় অজস্র যত্ন্যুরে
 পার হয়ে আসিলাম

আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়;
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।
ফিরিবার পথ নাহি,
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে
বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাতে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেইক্ষণে ঝুঞ্জে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিস্মৃতিপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়—
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্থাৎ তোমার উদ্দেশে।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি।
মর্তের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃতমুরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হোক তব সঙ্ক্যাবেলা—
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে,
ভূষার্ত আবেগবেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের খালে।
তোমার মানস ভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাবরসের পাত্র ব্যাধীর তুষায়
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধুলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
আজ্ঞেও তুমি নিজে
হয়তো—বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

মোর লাগি করিয়ে না শোক—
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।

মোর পাত্ৰ রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেৰে কৰিব পূৰ্ণ, এই ব্ৰত বহিব সদাই।
উৎকৰ্ঠ আমাৰ লাগি কেহ যদি প্ৰতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য কৰিবে আমাকে।
স্কন্ধপক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধাৰ বৃন্তখানি
যে পাৰে সাজাতে
অৰ্য্যথানা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমাৰে দেখিবাৰে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবাৰ পূজায় তানি আপনাৰে দিতে চাই বলি।
তোমাৰে যা দিয়েছিলু তানি
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকাৰ।
হেথা মোৰ তিলে তিলে দান,
কৰুণ মুহূৰ্ত্তগুলি গণ্ডুৰ ভৱিয়া কৰে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।
ওগো তুমি নিৰুপম,
হে ঐশ্বৰ্য্যবান,
তোমাৰে যা দিয়েছিলু সে তোমাৰি দান;
গ্ৰহণ কৰেছ যত ঋণী তত কৰেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

বন্যা

২৫ জুন ১৯২৮
ব্যালাক্ৰমি। বাঙ্গালোৱ

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপাঙ্কিত করুক।



বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র



* 9 8 4 1 8 0 0 7 6 4 4 0 5 *